মন কথা কয়না - অজেয় রায় Mon Kotha Koy Na by Ajeo Ray

এক শশাঙ্কনাথ বোস একটু আনমনাভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পিচ ঢাকা চওড়া বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, শরতের অপরাহ্নে উজ্জ্বল রোদের আভায় চকচক করছে। শশাঙ্কনাথের হাত স্টিয়ারিং-এর ওপর, সম্মুখে প্রসারিত চক্ষু কুঞ্চিত। বাস, লরি, প্রাইভেট গাড়ি ইত্যাদি "দ্রুতগতি যানগুলিকে অভ্যাসবশে পাশ কাটিয়ে চলছে তার ছাইরঙা অ্যামবাসাডর। শশাঙ্কনাথের মনে চিন্তার আলোড়ন! "মজা! অদ্ভুত মজা! ম্যাজিক!" প্রিয়রঞ্জনের কথাগুলো ঘুরছে তার মাথায়। কী ব্যাপার? খুব হইচই মজা করার ধাত নয় প্রিয়রঞ্জনের। ছেলেবেলা থেকে তিনি বইমুখো চাপা স্বভাবের। অবশ্য মাঝেমধ্যে বেয়াড়া রসিকতা। করার অভ্যাস ছিল তার। শশাঙ্ক অনেকবার বোকা বনেছেন, অপ্রস্তুত হয়েছেন তার পাল্লায়। পড়ে। এত দিন বাদে তাকে দেখে কী আবার মতলব জাগল প্রিয়র মাথায়? সন্দিগ্ধ শশাঙ্কনাথ ভেবে ভেবে এই হেঁয়ালির কুলকিনারা পান না। একটু যেন ভয়-ভয় করে তাঁর। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক কৌতূহল, কী এক রহস্যের হাতছানি বুঝি।

শশাঙ্কনাথ বোস এক আধা-বিলিতি বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে মোটা মাইনের অফিসার। গোলগাল চেহারাটি, আচ্ছাপ্রিয়, আমুদে মানুষ। বন্ধুদের খোঁজখবর নেন, সাধ্যমতো উপকারও করেন। পুরনো বন্ধুদের দেখা পেলে ছাড়তে চান না। তাই গত শুক্রবার বাল্যবন্ধু প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে যেমন অবাক তেমনি খুশি হয়েছিলেন তিনি।

পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গির মোড়ে দেখা হয়েছিল দু'জনের। লাল বাতির নিষেধে সার সার গাড়ি তখন থেমে পড়েছে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। শশাঙ্ক বা পাশের গাড়ির চালকের দিকে চেয়ে চমকে ওঠেন: প্রিয়রঞ্জন না? হ্যা, ঠিক! কী আশ্চর্য! বাঁ পাশের গাড়িটা লালরঙা ফিয়াট। তাতে আরোহী শুধু নিঃসঙ্গ চালক।

প্রিয়। —হুঙ্কার ছেড়ে ডাক দিয়েছিলেন শশাঙ্কনাথ। চালক মুখ ফিরিয়েছেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে অবাক হয়ে বলেছেন, আরে, শশাঙ্ক না?

—এগজ্যাক্টলি! এদ্দিন পরে!

শশাঙ্কের কথা শেষ হয় না, পথের লাল সংকেত হলুদ হয়, স্তব্ধ গাড়ির সারি যেন প্রাণ ফিরে পায়, ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ ওঠে। অতি ধীরে এগোতে থাকে গাড়িগুলি।

ওইখানে গাড়ি দাঁড় করা।-ইঙ্গিতে দেখিয়েছেন শশাঙ্ক। পার্কস্ট্রিটের মোড় পেরিয়ে একটু এসে চৌরঙ্গির ফুটপাথ ঘেঁষে দু'জনে গাড়ি পার্ক করেছিলেন। দরজা খুলে পথে লাফিয়ে পড়েছিলেন শশাঙ্কনাথ, পদভারে ফুটপাথ কম্পিত করে ধেয়ে গিয়েছিলেন সামনের ফিয়াট গাড়িখানার দিকে। প্রিয়রঞ্জন তখন সবে গাড়ির দরজা খুলেছেন। একরকম টনে-হিঁচড়ে তাকে নামিয়ে এনেছিলেন শশাঙ্ক। বিপুল কনিনাদে অফিস যাত্রীদের সচকিত করে অভ্যর্থনা জানিয়েহিলেনপ্রিয়, ইউ নটি বয়! কবে ফিরেছিস? কোথায় আছিস? কী করছিস? উঃ, চার বছর পরে দেখা!

শশাঙ্কের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শুধু মৃদু মৃদু হেসেছিলেন প্রিয়রগুন। প্রিয়রঞ্জনকে ভালো করে লক্ষ করেন শশাঙ্কনাথ। সেই একই চেহারা, কোনো পরিবর্তন হয়নি। কে বলবে, বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে। ফর্সা, লম্বা, এক যেন রোগ হয়েছে। উন্নত নাসিকা, দৃঢ়বদ্ধ অধরওষ্ঠ, চশমার পুরু কাচের আড়ালে ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চোখ। পরনে ট্রাউজার ও ফুলহাতা শার্ট। কবে ফিরলি দেশে? —প্রশ্ন করেছিলেন শশাঙ্কনাথ।

প্রায় বছর খানেক। আঁ, বছর খানেক। অ্যাদ্দিন কোনো পাত্তা পাইনি যে? আমায় খবর দিসনি কেন? —শশাঙ্কের স্বরে অভিমান। প্রিয়রঞ্জন কাচুমাচুভাবে বলেছিলেন, সময় পাইনি ভাই, বড় ব্যস্ত ছিলাম।

কবে ফিরছিস কানাডায়? —আপাতত ফিরছি না।

-কী করছিস এখানে?

-একটা কাজ নিয়েছি রেমন্ড ইলেকট্রনিকস-এ আর...বলতে বলতে প্রিয়রঞ্জন থেমে যান।

—আর কী? রিসার্চ বুঝি? ওঃ, তোর তো খুব নাম হয়েছে কানাডায়। কী সব সাংঘাতিক রিসার্চ, যুগান্তকারী। হাবুল বলছিল। হাবুলকে মনে আছে? সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত আমাদের সঙ্গে? এখন আমেরিকায় থাকে। ও দেশে এসেছিল দু'বছর আগে, বলেছিল। তোর কথা। তা তুই হঠাৎ চলে এলি যে?

-এমনি! অনেক দিন তো থাকলাম ওদেশে! -তোর চেহারা ফেরেনি কেন? অ্যাদ্দিন থাকলি অমন ভালো জায়গায়। কেন এখানটা খারাপ কী? তুই তো আরও মুটিয়েছিস।-জবাব দিয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন।

—চল আড্ডা মারা যাক। ওঃ, কত কথা জমে আছে। চল্ আমার বাড়ি।

—আজ থাক্। একটু কাজ আছে আমার।

=ধ্যেৎ! সারা জীবন শুধু কাজ আর কাজ। মাঝে মাঝে একটু ফুর্তি করতে হয়, বুঝলি? নইলে জীবনটায় মরচে পড়ে যায়। চল্ চল্।

নাঃ, আজ থাক্। বুঝেছি, আমার মতো মুখর সঙ্গে আড্ডা দিলে সময় নষ্ট। তুই এখন কত বড় বৈজ্ঞানিক! গরম হয়ে বলেছিলেন শশাঙ্কনাথ।

প্রিয়রঞ্জন বলেছেন, আহা, রাগ করছিস কেন? এই নে আমার ঠিকানা। আসছে শনিবার বিকেলে চলে আয় আমার বাড়ি, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর সিথির কাছে। একটা মজা দেখাব, অদ্ভুত মজা!

কৌতুক ঝিলিক দিয়েছে প্রিয়রঞ্জনের তীক্ষ্ণ চোখে। শশাঙ্কনাথ অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী মজা? দেখবি খন। ম্যাজিক। অবশ্য দেখাতে যে পারবই, গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

—প্রিয়রঞ্জন রহস্যময়ভাবে হেসেছিলেন। তোর বাড়িতে আর কে থাকে?—জানতে চেয়েছিলেন শশাঙ্কনাথ।

—আমি আর আমার একজন কাজের লোক, বাস্। নিকট আত্মীয়ের তো বালাই নেই মা মারা যাওয়ার পর!

আচ্ছা যাব।-সম্মতি জানিয়েছিলেন শশাঙ্ক।

আজ সেই উদ্দেশ্যেই চলেছেন। হঠাৎ থামালেন গাড়ি। ওই যে, লালরঙের খুব পুরনো। মস্ত বাড়ি। লোহার সবুজ গেট, মাথায় বোগেনভিলার ঝড়। গেটের মাঝে শেপাথরের ফলকে লেখা: মিত্রভবন। সব মিলছে প্রিয়রঞ্জনের বর্ণনার সঙ্গে।

পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে নামলেন শশাঙ্কনাথ। দেখলেন চারধার। নিত্রভবনের চারপাশ ঘিরে অনেক ছোট ছোট বাড়ি। কিছু দূরে একটা কলোনি। কয়েকটা ছোট ছোট দোকান। পথের পাশে নোংরা ডাস্টবিন। বোঝা যায়, মিত্রভবন ছিল বহুকাল আগে এক সুরম্য প্রমোদ-বন। আজ অবশ্য তার চেহারা জীর্ণ বার্ধক্য-ক্ষীণ।

এমন বাজে বাড়ি নিল কেন প্রিয়? কলকাতায় ভালো পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করে থাকার সামর্থ্য তো তার আছে।ভাবলেন শশাঙ্কনাথ। তারপর ধীরে ধীরে মিত্রভবন লক্ষ করে এগোতে থাকেন।

শশাঙ্কনাথ মিত্রভবনে পৌঁছেবার আগে দুটি যুবক বেরিয়ে এল ওই বাড়ির গেট খুলে। একজন পথের ধারে দাঁড় করানো একটা ছোট কালো গাড়িতে চেপে বসল। তারপর অন্যজনের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। দ্বিতীয় যুবক ফিরে যাচ্ছে, শশাঙ্কনাথ ডাকলেন—এখানে প্রিয়রঞ্জন রায় থাকেন?

যুবক গুরে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণ, লম্বা, শক্ত-গড়ন। চৌকে দৃঢ় চোয়াল। পরনে সাধারণ সুতির শার্ট ও টেরিকটের ফুলপ্যান্ট। একমুহূর্ত শশাঙ্কনাথকে তীক্ষ চোখে জরিপ করে নিয়ে বলল, হ্যা।

আছে প্রিয়?—শশাঙ্ক জানতে চাইলেন। আপনি?—যুবকের কণ্ঠে বিস্ময়, মুখের ভাব কঠিন।

বন্ধু। ওল্ড মেট। আমাকে আসতে বলেছিল আজ। আমার নাম শশাঙ্কনাথ বোস। নাম বললেই চিনবে।

ও আসুন।-যুবক নীরবে এগোতে থাকে বাড়ির দিকে। সদর দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকে বাঁ পাশে একটা মাঝারি ঘর দেখিয়ে যুবক বলল, বসুন, আমি স্যারকে খবর দিচ্ছি।

শশাঙ্ক ঘরে ঢুকলেন। এটি নিশ্চয় ড্রয়িংরুম। ঘরের ফ্যানটা ঘুরছে। হয়তো খানিক আগে লোক ছিল এই ঘরে। বোধহয় ওই যুবকটি বসেছিল এখানে। শশাঙ্কনাথ একটা

পর চেয়ার টেনে ঠিক ফ্যানের নিচে বসলেন। তারপর সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। অতি সাদামাটা করে সাজানো। দুটি সাধারণ কাঠের চেয়ার, একজোড়া পুরু-গলি আঁটা চোর, মাঝখানে একটি গোল টেবিল। দু'টি ছোট-ছাট টি-পয়—এ-ই আসবাব। ঘরের জানালাগুলো পর্দাটানা। নিয়নবাতি জ্বলছে। শৌখিন বস্তু বলতে তার নজরে পড়ল দুটি জিনিস: এককোণে টেবিলের ওপর রাখা বড় একটা অ্যাকোয়ারিয়াম এবং গৰিমোড় চেয়ারদুটির পিছনে চমৎকার এক টেবিলল্যাম্প। কারুকার্য-করা লম্বা স্ট্যান্ডের মাথায় ধাতু-নির্মিত এক প্রকাণ্ড আধখোলা পদ্ম-কুঁড়ি, তার মাথায় বা, তার ওপর ঘন সবুজ কাপড়ের ঘেরাটোপ। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতর ছোট্ট বাতি জ্বলছে, নানা বিচিত্র বর্ণ মাছ আলোয় উজ্জ্বল জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে।

পিছনে পায়ের শব্দ। শশাঙ্কনাথ মুখ ফিরিয়ে দেখেন, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন প্রিয়রঞ্জন।

হাল্লো প্রিয়!—লাফিয়ে উঠলেন শশাঙ্কনাথ।

বোস শশাঙ্ক। বাড়ি খুঁজতে অসুবিধে হয়নি তো?—বললেন প্রিয়রঞ্জন।

না। কিন্তু এমন ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুরে বাড়ি নিলি কেন? এই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, নির্ঘাত ভূত-টুত আছে।

–কেন, বাড়িটা খারাপ কী? অনেকটা জায়গা। কলকাতার হট্টগোল নেই। দিব্যি নিরিবিলি। তারপর? খবর বল্ তোর। বাড়ির সবাই কেমন? মাসিমা, তোর স্ত্রী সব

ভালো। তো? মেয়ের এবার কোন ক্লাস হল? যাব তোর বাড়ি। সেই পুরনো বাসাতেই আছিস তো? লেক রোডে?

শশাঙ্কনাথ ভাসা-ভাসা উত্তর দিলেন এসব প্রশ্নের। তাঁর মন ছটফট করছে: সেই কথাটা পাড়ছে না কেন প্রিয়? শেষে থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, সেদিন বললি, কী মজা দেখাবি। কই, দেখা। মজা!

—প্রিয়রঞ্জন থতমত খেলেন।

-হ্যা। বললি যে, ম্যাজিক! অদ্ভুত মজা!

-দূর, সে এমনি বলেছিলাম। শশাঙ্কনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারেন, প্রিয়রঞ্জন পাশ কাটাতে চাইছেন, তাঁর মুখ ভার দেখে প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, আরে, রাগ করছিস কেন?

-না ভাই, আমি মুখ মানুষ, তুমি পণ্ডিত। তোমার কাছে আমার রাগ-অভিমানের কী দাম।

প্রিয়রঞ্জন মাথা নিচু করে ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, বেশ দেখাৰ মজা! কিন্তু শশাঙ্ক, একটা কনডিশান আছে।

কী?

—যা দেখাব, কারও কাছে তা ফাঁস করা চলবে না। বাড়িতেও না। ইন নো সে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

অবাক হয়ে শশাঙ্ক বললেন, বেশ করেছি প্রতিজ্ঞা। একটু আনমনাভাবে প্রিয়রঞ্জন বললেন, অবশ্য দেখাতে পারব কিনা জানি না। সব সময় ঠিক হয় না। দেখা যাক, হোর লাক আর আমার হাতযশ। বলেই হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠেন প্রিয়রঞ্জন। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখ কাণ্ড, শুধু বকাচ্ছিস। অতিথি সৎকারে খেয়াল নেই। বংশী, ও বংশী, শুনে যাও তো একবার।.আরে, এই বিচ্ছিরি কেঠো চেয়ারটায় বসেছিস কেন? ওই গদিওয়ালা চেয়ারটায় আরাম করে বোস্।

প্রিয়রঞ্জন একরকম জোর করে শশাঙ্ককে তুলে এক গদি-দেওয়া চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। একজন মাঝবয়সি লোক উকি মারল দরজায়।

কী খাবি? চা, না, কফি?—জানতে চাইলে প্রিয়রঞ্জন।

—কফিই হোক।

বংশী, কফি আন এক কাপ। আমি এখন না, এইমাত্র খেয়েছি। বেশি চা-কফি খেলে ঘুম হয় না।

বংশী চলে গেল।

প্রিয়রঞ্জন নানা গল্প শুরু করলেন। বেশির ভাগ বিদেশে বেড়ানোর কথা। কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ-খবর নিলেন!!

একটু বাদে কফি এল, সঙ্গে উত্তম মাংসের প্যাটিস। শশাঙ্কনাথ খাইয়ে মানুষ। চটপট প্যাটিসলির সস্থ্যবহার করলেন। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, কই, এবার দেখা। প্রিয়রঞ্জন আশ্বাস দিলেন—হবে, হবে। ব্যস্ত কীসের!

একবার উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালার পর্দা ভালো করে টেনে দিলেন। ল্যাম্পের শেডটা একটু সোজা করলেন। ফের বসলেন। গল্প শুরু প্রলেন। হঠাৎ তিনি উঠে পড়লেন আবার। বললেন, শশাঙ্ক, প্লিজ একটু বোস্। এই পাঁচ মিনিট। একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে ফেলে এসেছি। ভুলে গিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরিতে ইন্সট্রুমেন্টগুলো গুছিয়ে রেখে আসছি। ভেরি সরি। বলে দ্রুতপায়ে প্রিয়রঞ্জন বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন শশাঙ্কনাথ। কোথায় পাঁচ দশ মিনিট কেটে গিয়েছে, প্রিয়রঞ্জনের দেখা নেই। চিরকাল খেয়ালী, ইদানীং যেন আরও বেড়ে স্বভাবটা।

এ কী রকম ভদ্রতা? আসতে বলল বিকেলে। হাতের কাজ সেরে রাখেনি কেন? নিজেই বলল, "মজা দেখাৰ",তারপর আর উচ্চবাচ্য নেই। নেহাত শশাঙ্কনাথ চাপ দিলেন, তাই রাজি হয়েছে।

ভাবছেন শশাঙ্কনাথ।

প্রিয় এই অজ্ঞাতবাসের কারণটা মনে হয়, চেনা-জানা জগৎ থেকে কিয়ে থাকতে চায়। ওর ফিরে আসার খবর তাই বন্ধুরা জানে না কেউ।

একটা সন্দেহ জাগল শশাঙ্কনাথের মনে। শুধু কি এটা নিরিবিলিতে বাস, না, অন্য কি? প্রিয় আমেরিকা কানাডা ফেরত। আজকাল হরদম শোনা যায়, সি.আই. এর নাম মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা। সেই রকম কোনো দলের খপ্পরে পড়েছে নাকি ও? গোপনে দেশের খবর পাচার করছে বিদেশি শক্তিকে? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে ওর নিশ্চয়ই এদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক দপ্তরে যাতায়াত আছে। এদেশে নতুন বৈজ্ঞানিক, আমিও তাই ভাবছিলাম। বললেন প্রিয়রঞ্জন। আবিষ্কার ও অগ্রগতির বহু খবর ও রাখে। তাই কি ওর এই পরিবর্তন? নির্জনে রিসার্চ-টিসার্চ তবে কি বাজে কথা?

নাঃ, প্রিয়র এমন অধঃপতন বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্রী সন্দেহটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন শশাঙ্কনাথ। একটা পত্রিকাও নেই ঘরে যে পড়বেন। ধ্যেৎ, সন্ধ্যাটা আজ মাটি হল। ক্লাবে গিয়ে তাস পিটলে বরং কাজ হত।

বেজার মুখে শশাঙ্কনাথ এমনি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকেন। একবার উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ান। আবার বসেন।

—অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, সরি! কখন্ প্রিয়রঞ্জন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন শশাঙ্কনাথ টের পাননি। সময় কাটাতে তিনি তখন অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলির খেলা দেখতে তন্ময়। প্রিয়র গলা শুনে চমকে ফিরলেন তিনি। ঘড়িতে আড়চোখে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, বেশি না, আধঘণ্টা। এবার সেই জিনিসটা দেখাবি কি দয়া করে দেখাব?

নিশ্চয়ই দেখাব। প্রিয়রঞ্জন বসলেন।

শশাঙ্কনাথের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, অপরাধ করেছি স্বীকার করছি, তা বলে আমায় একেবারে সি, আই-এর এজেন্ট ভাবা কিন্তু তোর উচিত হয়নি।

প্রিয়রঞ্জনের কথা শুনে শশাঙ্কনাথ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে স্তম্ভিত চোখে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

প্রিয়রঞ্জন আবার বললেন, ভাবছিলি, পাগলের পাল্লায় পড়ে সন্ধেটা নষ্ট হল, এর চেয়ে তাস পিটলেই ভালো হত। তা-ই না? মিস্টার কাপুর কেমন খেলেন ব্রিজ। আগেরবার তোত তোকে কমপিটিশনে ডুবিয়েছিলেন। তবে তাকে এবারেও নিলি কেন পার্টনার?

শশাঙ্কনাথের চোখ বিস্বারিত, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কিছু বলতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, বাড়ি ফিরবি, না, আজ রাতে থেকে যাবি এখানে? মজা দেখার উত্তেজনায় বউয়ের অর্ডার ভুলে গেছিস। বাড়ি যিলে কিন্তু আস্ত রাখবে না। কাল সকালে বরং নিউমার্কেট থেকে চীনে রান্নার মশলাটা কিনে নিয়ে বাড়ি ঢুকি। আমার বাঁধে খাসা, মুরগি আর পরোটা বানাবে! কী করবি বল। শশাঙ্কনাথ তোতলাতে তোতলাতে উচ্চারণ করলেন,

প্রিয়, তুই এসব জানলি কী করে? প্রিয়, তুই কি ম্যাজিক মানে হট রিডিং শিখেছিস, প্রিয়রঞ্জন সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, হু, কিছু কিছু।

প্রিয়, তুই কি সাধনা-টাধনা, মানে সাধু-টাধুর কাছে—শশাঙ্কনাথ আমতা-আমতা করেন।

নো সাধু সন্ন্যাসী বিজনেস!—প্রিয়রঞ্জন উত্তর দিলেন, আমি বৈজ্ঞানিক। আমার সাধনা অন্য পথে।

—প্রিয়, আমরা বন্ধু ছিলুম ছোটবেলার। প্লিজ, আমায় একটু বুঝিয়ে বলু, আমি কিছুই ধরতে পারছি না! | ছিলুম মানে? —প্রিয়রঞ্জন ভুরু কোঁচকান — এখন নেই?

হা হা, আছি বইকি। -সন্ত্রস্ত শশাঙ্কনাথ এই অলৌকিক ক্ষমতাধারী ব্যক্তিকে নিজের বন্ধু বলে দাবি করতে যেন ভরসা পান না। বলছি সব। আগে এক কাপ কফি হোক। আমিও খাব। —বললেন প্রিয়রঞ্জন। শুকনো গলায় টোক গিলে শশাঙ্কনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন।

কফিতে চুমুক দিয়ে একটুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন প্রিয়রঞ্জন। বোধহয় মনে মনে গুছিয়ে নিলেন নিজের বক্তব্য। তারপর বললেন, মানুষের শরীর-যন্ত্র এবং নিউরোসাইবারনেটিকস-এর রহস্য সম্বন্ধে তোর কোনো ধারণা আছে?

শশাঙ্কনাথ আমতা-আমতা করে বললেন, ইন্টারমিডিয়েটে অবিশি বাওলজি ছিল, কিন্তু সব ভুলে গেছি, চর্চা নেই।

-। আচ্ছা, দু-একটা সোজা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার গবেষণার মূল সূত্র। বেশি আলোচনা করে লাভ নেই, কারণ তোর মাথায় ঢুকবে না। তাছাড়া ওটা আমার সিকরেট, আপাতত ফাস করতে চাই না।

তা-ই ভালো। দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শোনার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়ে শশাঙ্কনাথ হাঁফ ছাড়লেন।

হ্যা, শোন,—প্রিয়রঞ্জন শুরু করলেন; বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ করেছেন, মানবদেহে প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন ও মানসিক আবেগের সঙ্গে তার দেহকোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, সৃষ্টি হয় একরকম বৈদ্যুতিক তরঙ্গের। জীবকোষ এমনভাবে তৈরি যে, প্রত্যেক কোষের আবরণ-ঝিল্লির অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের মধ্যে আয়ন-অসাম্য বর্তমান। এই অসাম্যের ফলেই বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি হয়। জীবনে প্রতিনিয়ত এমনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রাণীদেহে অসংখ্য স্নায়ুকোষের ভিতর দিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে : চিন্তা কী

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকেন প্রিয়রঞ্জন! তারপর আবার শুরু করেন: নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস, চিন্তা করার সময় আমাদের মনে নানারকম আধুনিক খবর বা পুরনো স্মৃতি জেগে ওঠে। কোনোটা তখুনি-তৈরি কোনো সমস্যার চিন্তা, কোনোটা বা পূর্বেকার ঘটনার স্মৃতি বা দৃশ্য। তখন আমরা নিঃশব্দে মনে মনে কথা বলি বা দৃশ্য দেখি। এভাবে আমাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালন করি। মস্তিষ্ক হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে আছে প্রায় কুড়ি সেটি নিউরন বা স্নায়ুকোষ। এই স্নায়ুকোষগুলি অ্যাক্সন বা স্নায়ুতন্তু দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।মানুষের মস্তি প্রতিমুহর্তে কাজ করে চলেছে। তার ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই প্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রেনে এই বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ-এর সৃষ্টি হয়। এই ওয়েত বা তরঙ্গকে সেরিব্রাল ওয়েভ বলা যেতে পারে। রেডিও বা টেলিভিশনে যে হার্টজিয়ান বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, এই তরঙ্গ প্রায় তারই মতো। মস্তিষ্কে উৎপন্ন এই তরঙ্গ প্রচণ্ড গতিতে এবং বিভিন্ন কল্পনাঙ্কে চতুর্দিকে শুনে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় তা আবার মস্তিষ্কের ভিতরেই স্থির তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কী রে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?

নীরবে ঘাড় নাড়লেন শশাঙ্কনাথ। প্রিয়রঞ্জন বলে চলেন : আমাদের মস্তিষ্কের আর একটি কেন্দ্রের কাজ হল এই স্থির তরঙ্গকে গ্রহণ করা। বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের সংবাদ-বাহক এই তরঙ্গগুচ্ছকে গ্রহণ করতে এই গ্রাহক কেন্দ্রকে মস্তি-পেশির সাহায্য নিতে হয়। মস্তিষ্কের প্রেরক কেন্দ্র এবং গ্রাহক কেন্দ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনকেই আমরা চিন্তা বলি। প্রত্যেকটি চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একশ্রেণির স্টেশনারি ওয়েভ বা সীমাবদ্ধ কনাঙ্কের স্থির বিদ্যুত্তরঙ্গগুচ্ছ।

আই সি। শশাঙ্কনাথের কণ্ঠে খুশিভরা উত্তেজনা। সেটা লক্ষ করে প্রিয়রঞ্জনও খুশি। বললেন, আরও একটু জ্ঞান দেব ভাই, ধৈর্য ধরে শোন। এবার স্মৃতি প্রসঙ্গে আসা যাক। স্মৃতি দু'রকম—ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী। সেরিব্রাল কর্টেকস-এর ঠিক নিচে হিপোক্যাম্পাস অঞ্চলে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির অবস্থান, আর দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি স্থির তরঙ্গরূপে জমা থাকে সেরিব্রাল কর্টেকস-এ। কোনো জিনিস নিয়ে বারবার চিন্তা করলে সেই ঘটনা বা চিন্তাতরঙ্গ সেরিব্রাল কর্টেকস-এর একরকম স্নায়ুকোষে জমা হয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, সেই চিন্তা বা সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুচ্ছ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে উঠে যায়। কোনো অতীত ঘটনাকে স্মরণ করার কায়দা হল আমাদের মস্তিষ্কের প্রেরক কেন্দ্রের দ্বারা পূর্ব-প্রচারিত স্থির তরঙ্গগুচ্ছকে গ্রাহক কেন্দ্রে গ্রহণের জন্যে মস্তিষ্কের পেশি-সঞ্চালন। একটি মস্তিষ্কের প্রেরক যন্ত্র যে সীমাবদ্ধ কম্পনাঙ্কের তরঙ্গগুচ্ছ উৎপন্ন করে, সাধারণত সেই মস্তিষ্কের গ্রাহক কেন্দ্রই সেগুলি গ্রহণ করতে পারে। আমাদের চিন্তারাশির উৎস মস্তিষ্কের ভিতরে লুকিয়ে থাকলেও ওর প্রভাব বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুচ্ছের আকারে মস্তিষ্কের বাইরে মহাশূন্যেও ছড়ায়।

যদি দুটি লোরে মস্তিষ্কের গঠন এমন হয় যে, একটির প্রেরক কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়া চিন্তাতরঙ্গ অপরটির গ্রাহক কেন্দ্র ধরতে পারে, তাহলে একজনের চিন্তা-ভাবনা অন্যজন জানতে পারবে।

প্রিয়রঞ্জন হড়হড় করে যেন ঘোরের মধ্যে বলে যাচ্ছেন। শশাঙ্কনাথ অবাক হয়ে ভাবছেন, প্রিয় এখন কী চমৎকার বাংলা বলে! এত শক্ত-শক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলি বাংলায় বোঝাচ্ছে। এত বছর বিদেশে থেকেও বাংলা ভোলেনি। দেশে থাকতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্যে আন্দোলন করত ও। জেদটা বজায় রেখেছে।

—কী রে, অসুবিধা হচ্ছে না তো বুঝতে ? চমকে উঠে শশাঙ্কনাথ থতমত খেয়ে বললেন, না... মানে...

—কেন? এ তো খুব সোজা ব্যাপার! আচ্ছা, একটা সোজা উদাহরণ দিচ্ছি। রেডিও অপারেশনের সূত্রটা জানিস? শশাঙ্কনাথ উজ্জ্বল মুখে ঘাড় নাড়লেন—হ্যা, মোটামুটি!

—প্রায় সেইরকম ব্যাপার এটা। রেডিওর ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে নানারকম রেডিও ওয়েভকে প্রচার করা হয়। আর আমাদের রেডিও-যন্ত্রে থাকে রিসিভিং সেন্টার অর্থাৎ গ্রাহক কেন্দ্র। কোনো বিশেষ বেতার তরঙ্গকে ধরতে গেলে আমরা রেডিওর রিসিভিং নবকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় টিউন করে নিতেই শুনতে পাই সেই তরঙ্গে প্রচারিত ধ্বনি। আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কে একটি প্রেরক কেন্দ্র এবং একটি গ্রাহক কেন্দ্র থাকে। কিছু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি টেলিপ্যাথি বা মানসিক যোগসাধন করতে পারেন। এতে থট রিডিংও বলা যায়! বোধহয় তারা যোগ-অভ্যাসের দ্বারা মস্তিষ্কের পেশি সঞ্চালন করে এই ক্ষমতা আয়ত্তে আনেন। তখন অন্যের পাঠানো চিন্তাতরঙ্গ তাঁর নিজের মস্তিষ্কের গ্রাহকযন্ত্রে ধরতে পারেন। আবার হিপনোটিজম বা সম্মোহন যারা করতে পারেন, তাঁরা বিশেষ সাধনাবলে নিজের মস্তিষ্কের পেশি সঞ্চালন করে অতি তীব্র চিন্তাতরঙ্গ পাঠিয়ে আর একজনের মস্তিষ্ককে অবশ করে দিতে পারেন। এও একরকম মানসিক যোগসাধন।

এবার ব্যাপারটা অনেকটা সহজ লাগছে।-শশাঙ্কনাথ বললেন।

বেশ।—প্রিয়রঞ্জন বলতে থাকেন : শুনেছিস বোধ হয়, যমজ ভাই-বোনেরা অনেক সময় দূরে থেকেও একে অন্যের মনের কথা জানতে পারে। এর কারণ হল, জন্মসূত্রে দু'জনের মস্তিষ্কের গঠনে যান্ত্রিক মিল। তাই একজনের মস্তিষ্কের প্রেরক যন্ত্র থেকে পাঠানো চিন্তাতরঙ্গ অন্যজনে ধরতে পারে। | বুঝেছি।—বললেন শশাঙ্কনাথ, তুই টেলিপ্যাথি শিখেছিস। কার কাছে শিখলি? কোনো ম্যাজিশিয়ান?

-না। আমি মানুষের চিন্তাতরঙ্গকে ধরবার একটা উপায় আবিষ্কার করেছি। এর মধ্যে কোন অলৌকিক কাণ্ড নেই, এটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশল, অর্থাৎ টেকনোলজি। যন্ত্র! কোথায়?—শশাঙ্কনাথ ঘরের এদিক-সেদিক তাকান। এঘরে নেই, পাশের ঘরে।—জানালেন প্রিয়রঞ্জন। এই ঘরে আছে শুধু একটা অ্যানটেনা। এই অ্যানটেনার সঙ্গে যন্ত্রের বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ আছে। আনটেনা চিন্তাতরঙ্গগুচ্ছকে গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেয়া হয়ে।

এ ঘরে কোথায় অ্যানটেনা?

শশাঙ্কনাথের কৌতূহলী দৃষ্টি খুজতে থাকে চারধার।

লুকোনো আছে তোমার চেয়ারের পিছনে ল্যাম্পসেডের ভিতরে। আর ওই যে অ্যাকোয়ারিয়ামটা দেখছিস, ওর মধ্যে একটা বাস্ব জ্বলছে। নজর করলে দেখতিস, যখন তই প্রথমবার কফি খাচ্ছিলি, তখন আর একটা ছোট্ট বা জ্বলে উঠেছিল ওর মধ্যে। অ্যাকোয়ারিয়ামের পিছনে একটা সুইচ আছে। আমি ঘুরতে ঘুরতে সুইচটা অন করে দিয়েছিলাম। তারপর আকোয়ারিয়ামের দ্বিতীয় বাটা ভুলে ওঠা মাত্রকলাম, অ্যানটেনা মারফত তোর চিন্তাতরঙ্গ আমার যন্ত্র ধরতে পেরেছে। অসংখ্য মানুষের চিন্তাতরঙ্গের প্রকৃতিও বহুরকম। সবরকম সেরিব্রাল ওয়েভকে ধরার মতো বিদ্যে এখনও আমার হয়নি। যদি কারও চিন্তাতরঙ্গ আমার যন্ত্রে ধরা পড়ে, তার অটোম্যাটিক সিগনাল দেয় ওই অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকোনো বা। এখন সুইচ অফ করে দিয়েছি ভিতর থেকে, তাই বাল্বটা জ্বলছে না।

—আমার চিন্তা তুই জানলি কী করে এখানে বসে?

এখানে বসে নয়, ভিতরে গিয়ে আমার যন্ত্রের কাছ থেকে জেনেছি। তাই তো তোকে বসিয়ে রাখলাম এতক্ষণ। তোকে চিন্তা করার সুযোগ দিলাম। আর সেই চিন্তা চুরি করে জেনে নিলাম আমি।

—একবার তোর যন্ত্রটা দেখাবি ভাই? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

—আপত্তির কী আছে? চল ও ঘরে।

পরের অংশ পড়ুন এখান থেকে।

১০।প্রতিশোধ১২। খাতা চুরি রহস্য

মন কথা কয়না   অজেয় রায়

চার

প্রিয়রঞ্জন ও শশাঙ্কনাথ ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে পাশেই আর একটা বড় ঘরে প্রবেশ করলেন। এ-ই আমার চিন্তা-গ্রাহক যন্ত্র।-দেখালেন প্রিয়রঞ্জন।

শশাঙ্কনাথ একবার ম্যাসেঞ্জার জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমে ঢুকেছিলেন। ঘরের মাঝখানে যন্ত্রটা যেন তারই ছোট সংস্করণ। ক্যাবিনেটের মতো দেখতে, প্রায় মানুষ সমান উচু, হাত দুই চওড়া, সাত-আট ফুট লম্বা ধাতু ও প্লাস্টিকের আবরণে তৈরি যন্ত্রটা। তাতে প্রচুর খোপ-খোপ। খোপগুলি কোনোটি কাচে ঢাকা, কোনোটি বা ভোলা। প্রত্যেকটি খোপের ভিতর সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি। বিচিত্র তাদের গড়ন, ডায়াল, মিটার, ছোট ছোট বাথ, মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য বৈদ্যুতিক তার এক অংশের সঙ্গে অন্য যন্ত্রাংশের সংযোগ ঘটাচ্ছে। এ

ছাড়া ঘরের কোণে দুটি বড় বড় লোহার বাম, তাতে লাগানো মোটা মোটা পাচালো নল ও তার। ঘরের ছাদে ও দেওয়ালের গায়েও অদ্ভুত

তর কিছু যন্ত্র। তাদের গা থেকে বৈদ্যুতিক তার এসে যুক্ত হয়েছে প্রধান যন্ত্রের সঙ্গে। গোটা ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ঘরের তিনটে জানালা পুরু কাচের শাশি-বন্ধ। উফল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে ঘরে।

শশাঙ্কনাথ চিন্তাগ্রাহক যন্ত্রের চারপাশে বারকয়েক পাক খেলেন। দেওয়াল ও ছাদে ঘর ঘুরিয়ে দেখলেন এবং বিয়ের মতো মাথা দুলিয়ে আওয়াজ ছাড়লেন—হুম!” অতঃপর তিনি যন্ত্রের একটা অংশের দিকে ভীষণ ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন কোনো খুত আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো একটা স্টিলের আলমারি খুলে টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেটের মতো ছোট্ট একটা বাক্স বের করলেন প্রিয়রঞ্জন। সেটা দেখিয়ে বললেন, শশা দেখ, এর মধ্যে বন্দি হয়ে আছে তোর মিনিট পনেরো চিন্তা। শশাঙ্ক অবাক হয়ে বললেন, কী করে? কী এটা?

—এক বিশেষ ধরনের টেপ এটা। যেমন গান বা কথার ধ্বনি টেপে রেকর্ড করা হয়, এও প্রায় সেই ব্যবস্থা। কী, পরখ করে দেখবি নাকি নিজে? মনে আছে কী ভাবছিলি তখন?

ঠিক-ঠিক মনে নেই। দেখি একবার। শশাঙ্কনাথের মনে দারুণ কৌতূহল। বোস এই চেয়ারটায়।

—নির্দেশ দিলেন প্রিয়রঞ্জন। শশাঙ্কনাথ বসলেন। প্রিয়রঞ্জন একটা ধাতু-নির্মিত হেলমেটের মতো জিনিস আলমারি থেকে বের করে পরিয়ে দিলেন তার মাথায়। হেলমেটটায় কয়েকটি সরু সরু শিং। এই শিংগুলি বৈদ্যুতিক 'তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল টেবিলে রাখা এক বাক্সের সঙ্গে।

লাগবে না তো? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন শশাঙ্কনাথ।

না না, কোনো ভয় নেই! —আশ্বাস দিলেন প্রিয়রঞ্জন

—শুধু একটু শির শির করবে মাথার ভিতর। মনে হবে, কেউ যেন ফিসফিস করছে নিঃশব্দে।

ক্যাসেটটা ওই বাক্সের এক খোপে সাবধানে বসিয়ে দিলেন প্রিয়রঞ্জন। আরও কিছু যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করলেন। তারপর একটা সুইচ টিপলেন। বললেন শশাঙ্ক, চোখ বুজে লে। তাতে মনঃসংযোগ করতে সুবিধা হবে।

মৌমাছির গুঞ্জনের মতো অতি মৃদু ধ্বনি জাগল ঘরে।

চোখ টিপে কাঠ হয়ে আছেন শশাঙ্কনাথ। কিন্তু তার মনে যে বিষম উত্তেজনা হচ্ছে, তা বোঝা যায় দু'মুঠোয় শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন চেয়ারের হাতল, মুখ হাঁ, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। খট!

পাঁচ মিনিট পরে সুইচ অফ করে দিলেন প্রিয়রঞ্জনের গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গেল। বিস্ফারিত। চোখ খুলে শশাঙ্কনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন—ওয়ানডারফুল! ম্যাজিক! ভেলকি। প্রিয়, তুই একটা জিনিয়াস! উঃ, সব মনে পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখন যা-যা ভেবেছিলাম। এমনকী সেই গোল দেওয়ার সিনটা অবধি দেখলাম অবিকল। হঠাৎ ফুটবল খেলার কথা তখন মনে এল কেন?

=প্রিয়রঞ্জন বেশ অবাক হয়ে বললেন, আর দেখ, প্লেয়ারগুলো যেন, মনে হচ্ছিল আমার খুব চেনা-চেনা। মানে তোকে ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে আমি যখন টেপ চালিয়ে তোর চিন্তাকে আমার মগজে চালান করে দেখছিলাম, তখনকার কথা বলছি।

হবেই তো চেনা!—শশাঙ্কনাথ উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেন, ওটা হচ্ছে ইন্টার-ক্লাস ফাইনালে আমাদের ক্লাস টেন-এর সঙ্গে নাইনের খেলার দৃশ্য। সব তোর চেনা ছেলে। আমি ওদের হাফকে কাটিয়ে ঘু দিলাম, আর লেফট ইন বঙ্কা, সেই যে, আমাদের সেশনে পড়ত রে, চমৎকার প্লেস করে গোল দিয়ে দিল সেই সিনটা! জিজ্ঞেস করছিলি, হঠাৎ ফুটবল খেলার কথা আমার মনে এল কেন? আরে, খানিক চেয়ারে বলে তোর জন্য অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি, পাশের মাঠে কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছে। অমনি আমার সেই পাস আর বঞ্চার গোল দেওয়ার সিনটা আমার মনে একেবারে স্পষ্ট ভেসে উঠল। ও, তুই, বুঝি এইভাবে আমার ওই সময়ের চিন্তা চুরি

করে জেনে নিয়েছিস।

হ্যা, এ হচ্ছে চিন্তা চুরির একটা উপায়।—বললেন প্রিয়রঞ্জন। প্রথমে চিন্তাতরঙ্গকে অ্যানটেনার সাহায্যে রিসিভ করে তাকে বিশেষ ধরনের ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করা হয়। এরপর ফের সেই টেপ থেকে তাকে ইলেকট্রিকাল ইম্পালস-এ ও থট ওয়েভে রূপান্তরিত করা যায়। টেপে সংগ্রহ করা কারও চিন্তাতরঙ্গ অন্যজনের মগজে চালান করা হয় এইভাবে ইলেকট্রোড-এর সাহায্যে। আর একজনের চিন্তা অন্যজনের মগজে যাতে গ্রহণ করতে পারে, সেইমতো চিন্তারদের ফ্রিকোয়েনসি বা কম্পনাঙ্ককে অদল-বদল করে দেওয়া হয়। এ-ই হচ্ছে সবচেয়ে সোজা এবং দ্রুত চিন্তা চুরির উপায়।

এছাড়াও আমি এমন উপায় আবিষ্কার করতে পারব মনে করছি, একটু থেমে আবার বলেন প্রিয়রঞ্জন, যাতে কারও নিঃশব্দ ভাবনা অন্যে শুনতে পাবে বা তার মনে-মনে-দেখা ছবি অন্য লোকে সিনেমার মতো পর্দায় দেখতে পারবে। অবশ্য এই দুটি উপায় খরচসাপেক্ষ, আর এ নিয়ে আমার গবেষণা এখনও খুব বেশি দূর এগোয়নি। তবে

ভবিষ্যতে, আশা করছি, পারব।

আঁ, বলিস কী!—শশাঙ্কনাথের চক্ষু ছানাবড়া।

—আসলে মূল সূত্রটা সব জায়গাতেই এক। এনার্জি বা শক্তির রূপান্তরের ওপরই সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তার সময় আমরা হয় মনে মনে নিঃশব্দে কথা বলি কিংবা কোনো ছবি দেখি। এই দু'টি কাজের সময় মস্তিষ্ক-পেশির সঞ্চালনের ফলে তৈরি হয় চিন্তাতরঙ্গ। একবার যখন এই তরঙ্গকে ধরতে পেরেছি, তখন নিঃশব্দ ভাবনাকে সাউন্ড এনার্জিতে বা মনে-মনে-দেখা দৃশ্যকে ভিডিও টেপে ধরে লাইট এনার্জিতে রূপান্তর করা অসম্ভব হবে না। তবে সময় লাগবে।

আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাব, আমার নিঃশব্দ চিন্তাকে যদি সশব্দ করতে পারিস?—জিজ্ঞেস করলেন শশাঙ্কনাথ।

তা বোধহয় পারব না! -হেসে বললেন প্রিয়রন, সশব্দ চিন্তার ধ্বনি হবে মেশিনের ধাতব শব্দ, কোনো মানুষের গলার আওয়াজ নয়।

উঃ, এ যে ভীষণ ব্যাপার। শশাঙ্কনাথ উত্তেজনার চোটে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন।

হাঁ, বিষয়টা খুবই জটিল।—উত্তর দিলেন প্রিয়রঞ্জন

—পৃথিবীতে মাত্র গুটি কয়েক বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে গবেষণা করছেন। এর পিছনে আমি বহু বছর পরিশ্রম করেছি। আরও কত দিন করতে হবে জানি না।

আচ্ছা, এই যন্ত্র আমাদের কী কাজে লাগবে ভেবেছিস?—প্রশ্নটা করে শশাঙ্কনাথ একই অগ্রত হলেন।

নিশ্চয়ই।—বললেন প্রিয়রঞ্জন, আমার এই আবিষ্কার মানব সমাজে বিপ্লব ঘটাবে। আমার যন্ত্র বহু ক্রিমিনালের দুষিত চিন্তাকে আগেভাগে জেনে ফেলবে, অনেক পাষণ্ড রাজনীতিবিদের মনের গোপন অভিলাষ ধরে ফেলবে। শান্তিপ্রিয় সং মানুষকে সতর্ক করে দেবে। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধ্বংস, হত্যা, ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

বলতে বলতে প্রিয়রঞ্জন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তা বটে তা বটে। সায় দিলেন শশাঙ্কনাথ। আচ্ছা, এর জন্যে তো অনেক জিনিসপত্র, মানে যন্ত্রপাতি দরকার?-ঘরের মাঝে চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন শশাঙ্কনাথ।

—নিশ্চয়ই। অনেক সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগে। সবই প্রায় আমার উদ্ভাবন, তৈরি করিয়ে নিতে হচ্ছে।

—এসব জিনিস পেতে এখানে অসুবিধে হয় না?

হয়। নানা জায়গা থেকে অর্ডার দিয়ে পার্টসগুলো তৈরি করাই। সব সময় ঠিক পছন্দসই হয় না, বার বার ভুল করে। এক জায়গা থেকে বেশি জিনিস করাই না, কী জানি, যদি কারও মনে সন্দেহ হয়, আমার রিসার্চ জানতে গুপ্তচর লাগে।

—তা তুই কানাড়া ছাড়লি কেন? ওসব দেশে, শুনেছি, এমন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি অনেক ভালো তৈরি করে। রিসার্চের সুবিধে বেশি।

প্রিয়রঞ্জন একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ছাড়লাম বাধ্য হয়ে। কারণ ওখানে পিছনে লোক লেগেছিল। ওখানে আরও একজন বৈজ্ঞানিক ঠিক এই বিষয়

নিয়েই গবেষণা করছে। সে বোধহয় আমার রিসার্চের সাফল্যের কথা কিছু টের পেয়েছিল। দু-দু'বার আমার রিসার্চ পেপারস ও মেশিনের ডিজাইন চুরি করার চেষ্টা হয়। তখন বাধ্য হয়ে আমি ওদেশ ছাড়ি।

—কিন্তু এদেশে কি তোর রিসার্চের গুপ্তরহস্য চুরি যাওয়ার ভয় নেই?

—নেই বলা উচিত নয়। সে ভয় সবসময়ই আছে। তবু এখানে আমি অনেক বেশি নিরাপদ, কারণ এই কাজ করছেন এমন বৈজ্ঞানিক এদেশে কেউ নেই। কাজেই আমার গবেষণা সম্বন্ধে এখানে কারও বিশেষ কৌতুহল হবে না।

—কিন্তু তোর বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বী যদি তোকে এখানে ফলো করে আসে? প্রিয়রঞ্জনের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যদি নয়, সত্যিই সে আমায় ফলো করেছে।

থ। তার নাম ডক্টর আয়ার। জন্মসূত্রে ভারতীয়, তবে এখন পাকাপাকিভাবে বিদেশে থাকে। ভীষণ ধূর্ত লোক। ওর ইচ্ছে ছিল, আমার সঙ্গে একসঙ্গে এ বিষয়ে রিসার্চ করবে।

আমি রাজি হইনি। খুব চটেছিল তাই। পিলু আয়ার গত হপ্তায় কলকাতায় এসেছে। খোঁজ নিয়ে ঠিক বের করেছে আমার খবর। অফিসে এসেছিল দেখা করতে। বলল, "তিন মাসের জন্যে ভারতে এসেছি টাটা ইন্সটিটিউটে একটা কাজ নিয়ে। আর কলকাতায় সে এসেছে নাকি এর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এটা-সেটা কথার পর আয়ার জানতে চাইল আমি সেই পুরনো রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছি কিনা। সাফ না বলে দিলাম। ওর মুখ দেখে মনে হল, ও আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

–ডেনজারাস! প্রিয়, তুই এখান থেকে সরে পড়ে অন্য কোথাও গা-চাল দে।

-এখন আর তা সম্ভব নয়। যন্ত্র ফিট করে ফেলেছি। তাছাড়া একটা চাকরিও চাই পেট চালাতে। তবে সাবধানে থাকতে হবে। অবশ্য এখানে আমার খুব সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।

তুই কি এইসব কাজ একা-একা করিস?—জিজ্ঞাসা করলেন শশাঙ্কনাথ।

-না, দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে।

-ওই যে দেখলাম একটা হেলেকে, কালো মতো লম্বা করে, ও?

-হ্যা, ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, নাম সমীর কর। ফিজিক্সে এমএসসি। আর একজন আছে বিশু, মানে, বিশ্বম্ভর রক্ষিত। স্কুল ফাইনাল পাশ। তবে রেডিও, ওয়্যারলেস ইত্যাদি যন্ত্র সম্বন্ধে চমৎকার মাথা! ওরা অন্য কাজও করে, অবসর সময়ে আমায় সাহায্য করে। সমীর একটা কলেজের লেকচারার, আর বিশু রেডিও মেরামত করে রোজগার করে। দুজনকেই এখানে থাকবার ঘর দিয়েছি, কারণ সন্ধেবেলা আর রাতে আমি মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে কাজ করি। ফলে সেসব রাতে ওদের এখানে থাকতে হয়।

ওরা বিশ্বাসী তো?

-মনে তো হয়।

ওরা এই যন্ত্র চালাতে পারে?

—পারে। আমার নিজের প্রয়োজনেই শিখিয়েছি।

—যদি ওরা বিট্রে করে, ফাস করে দেয় তোর রিসার্চের কথা? যন্ত্র আবিষ্কারের কথা?

—এই রিসার্চের আসল রহস্য ওরা বাস করতে পারবে না, বড় জোর বিষয়টা ফাস করে দিতে পারে। এই যন্ত্রের বা রিসার্চের মূল সূত্রগুলি আমি ওদের জানতে দিইনি।

তবু ...খুতখুত করে শশাঙ্কনাথ। প্রিয়রঞ্জন বললেন, তুই তো রেডিও চালাতে-বন্ধ করতে পারিস, কিন্তু রেডিও কী ভাবে বাজছে তার রহস্য জানিস?

—ঘাড় নাড়লেন শশাঙ্কনাথ।

–ওদের অবস্থাও তা-ই। তাছাড়া ওরা প্রতিজ্ঞা করেছে, এই রিসার্চের খবর কাউকে জানাবে না। আর আমি কথা দিয়েছি, আমায় সন্তুষ্ট করতে পারলে প্রতিদান-স্বপ ভবিষ্যতে ওদের ভালো চাকরি জোগাড় করে দেব, প্রচুর পুরস্কারও দেব। সুতরাং আমার রিসার্চের বিষয় মাস করে ওদের লোকসান বই লাভ নেই।

—কিন্তু ডঃ আয়ার?

হুঁ। প্রিয়রঞ্জন কেমন অন্যমনস্ক হলেন। বুজা গেল, আয়ার সম্বন্ধে একটা দুশ্চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে।

হাতের ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শশাঙ্কনাথ-এবার চলি। উঃ, দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হল! কিন্তু ভাই, আর আমি এখানে আসছি নে। কেন? প্রিয়রঞ্জন অবাক।

-মানে, এলেও তোর এই ড্রইংরুমে বসছি নে। কখন যন্ত্র চালিয়ে আমার মনের সব গোপন চিন্তা-চুরি করে জেনে নিবিঃ ডেনজারাস।

-বেশ, ওঘরে বসিসনি, অন্য ঘরে বসাব তোকে। কিন্তু আসিস মাঝে মাঝে। শনিবার সন্ধেটা সাধারণত কাজ করি না, বিশ্রাম নিই। বড় খাটুনি। একঘেয়ে কাটে। একটু আড়া মারলে ফ্রেশ লাগবে।

প্যাসেজ দিয়ে বাইরে হাঁটতে হাঁটতে শশাঙ্কনাথ বললেন, প্রিয়, আর কেউ যদি তোর খবর জানতে চায়, তোদর ঠিকানা চায়, কী করব? বলব, না, চেপে যাব? বন্ধু-বান্ধব কখনও কখনও তোর খোঁজ করে আমার গছে।

একটু ভাবলেন প্রিয়রঞ্জন। তারপর বললেন, “একেবারে জানি নে বলা ঠিক হবে না। মিথ্যে বলছিস জানাতে পারলে সন্দেহ হবে। নিজে থেকে কাউকে আমার কথা জানানোর দরকার নেই। তবে কেউ যদি টের পায়, আমি এখানে আছি, জিজ্ঞেস করে আমার কথা, বলিস আমি ফিরে এসেছি, রেমন্ড কোম্পানিতে চাকরি করছি। ঠিকানা জানতে চাইলে দিতে পারিস। তবে বলবি, বেজায় ব্যস্ত থাকি চাকরি নিয়ে, বাড়িতে প্রায় থাকিই না। তবে আমার এই রিসার্চের খবর যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না টের পায়।

হা হা, সে আর বলতে। প্রিয়রঞ্জন বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ড্রাইভারের সিটে জাকিয়ে বসেছেন। শশাঙ্কনাথ! প্রিয়রঞ্জন বললেন, চীনে রান্নার মশলার কথা ভুলিসনি যেন। কিনে নিয়ে যাস।

চমকে শশাঙ্কনাথ বললেন, রাইট! ঠিক বলেছিস। ফের ভুলে গেছলাম।

প্রিয়রঞ্জন হেসে বললেন, দেখ তবে প্রমাণ হয়ে গেল আমার চিন্তা-চুরি যড় কেমন কাজের। নইলে তোর বউয়ের ফরমাশ জানতে পারতাম না, মনে করিয়েও দিতাম না। আর তুই বাড়িতে গিয়ে বকুনি মেসি।

সত্যি ভাই, আজব কল বানিয়েছিস বটে। প্রশংসায় গদগদ শশাঙ্কনাথ মোটরে স্টার্ট দিলেন।

পাঁচ

মিত্রভবনের একতলায় একটি মাঝারি ঘর। ঘরের মধ্যে একটি সিঙ্গল খাটে পাতা বিছানা, বেডকভার দিয়ে ঢাকা। ঘরের কোণে পড়ার টেবিল ও সামনে একটা চেয়ার। টেবিলে বই, একটা বিদেশি ক্যালকুলেটিং মেশিন, বড় সাইজের একটা খাতা খোলা অবস্থায় রয়েছে। এই ঘরের বাসিন্দা প্রিয়রঞ্জনের সহকারী সমীর কর!

সমীর ঘরেই রয়েছে। সে অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছে ঘরের ফাঁক জায়গাটুকুতে আর নিজের মনে বিড় বিড় করে বকছে। তার চোখে মুখে চাপা উত্তেজনার টকটক! বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল।

চমকে স্থির হল সমীর। প্রশ্ন করল, কে?

আমি। স্যার! তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে দরজার কপাট ফাক করল সমীর। আজ এত ভোরে উঠেছেন প্রিয়রঞ্জন, কী ব্যাপার?

প্রিয়রঞ্জন ঘরে ঢুকলেন। পরনে পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক, হাতে ব্রিফকেস। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে তিনি কৌতুহলী সুরে বললেন, ব্যাপার কথা বলছিলে কার সঙ্গে? আঙো, কেউ না। সমীর লজ্জা পেল।

বুঝেছি, নিজের মনে বকছিলে দেখে নেব', 'আর বেশিদিন নয়”

এসব কথার মানে? সমীর ঢোক গেলে। ঘামতে থাকে। একটু সামলে নিয়ে বলে, আরে, এ আমার এক বদভ্যাস। স্টুডেন্ট লাইফে অনেক থিয়েটার করেছি। কাজ করতে করতে একঘেয়ে লাগলে নিজের মনে নাটকের ডায়ালগ আওড়াই।।

প্রিয়রঞ্জন স্ত্রী চোখে সমীরকে লক্ষ করলেন। বললেন, তোমায় বড় শুকনো দেখাচ্ছে। ঘুম হয়েছিল রাতে?

—আজ্ঞে, একটু রাত হয়ে গিয়েছিল শুতে। বই পড়তে পড়তে...

—আমার ক্যালকুলেশন কদুর ?

—প্রায় হয়ে গিয়েছে, কাল পেয়ে যাবেন।

—গুড! কিন্তু বেশি স্ট্রেইন কোরো না। ভালো কথা, কাল রাতে তুমি মেশিনঘরে গিয়েছিলে কেন? কী করছিলে?

এবার সমীর রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়ে। ঢোক গিয়ে উত্তর দিল, হঠাৎ একটা এক্সপেরিমেন্ট মাথায় এল। খুব দ্রুত চিন্তা রেকর্ড করে সেটা ধীরে ধীরে ট্রান্সমিট করা যায় কিনা পরীক্ষা করছিলাম।

—হু। কাল একজনকে এনেছিলে এ বাড়ি। থট রিডিং করতে নাকি?

—হ্যা স্যার, ইচ্ছে ছিল তা-ই।

—পারলে? আজ্ঞে না-হতাশভাবে উত্তর দিল সমীর।

—বিশু ফিরেছে বাড়ি থেকে?

-জানি না ঠিক। কাল ওর ঘর বন্ধ দেখলাম। ও ফিরলে বলবে, শীঘ্রই ওকে একবার বাঙ্গালোর পাঠাব, যেন তৈরি থাকে। ভারত

ইলেকট্রনিয়ে কয়েকটা কাপলিং আর ভ্যাকুয়াম টিউবের অর্ডার দিয়েছি। ওকে ডিজাইন মিলিয়ে টেস্ট করে আনতে হবে। আর ওকে বলবে চটপট কিছু স্যাম্পল কেস নিতে। এই আশপাশের লোক ডেকে এনে তাদের সেরিব্রাল ওয়েভ রেকর্ড করার চেষ্টা করুক। ওর বেশ চেনা-শোনা আছে এ পাড়ায়। তোমার তো নেই!

আরে না।

হু। দূর থেকে লোক ডেকে আনা বাজে সময় নষ্ট। এ ব্যাপারে তোমার-আমার চেয়ে বিই বেশি কাজের। আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে বড় বড় গ্যাপ থেকে

যাচ্ছে। প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট না হলে মানুষের চিন্তাতরঙ্গের রেঞ্জটা ঠিক বোঝা যাবে না। টেপগুলো যত্ন করে রেখে দেবে। আমি সময় পেলেই শুনব।

বেশ, বলে দেব বিকে। প্রিয়রঞ্জনের কথাবার্তা ভিন্ন পথ ধরতে সমীর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—আর শোন,আমি দমদম এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। আমার এক পরিচিত সায়ানটিস্টের। আসার কথা, দেখা করব। হয়তো ওকে সঙ্গে নিয়েও আসতে পারি। লাঞ্চ রেডি লেখো।

দরজার দিকে ফিরে ফের ঘুরে দাঁড়ালেন প্রিয়রঞ্জন—সমীর, একটা কথা। যদি কোনো নতুন এক্সপেরিমেন্টের আইডিয়া তোমার মাথায় আসে, আগে আমাকে বলবে। প্রয়োজন মনে হলে আমি নিয়ে পরীক্ষা করব। অবশ্য তুমিও থাকবে সঙ্গে। কিন্তু আমার অজান্তে মেশিনে কোনো নতুন পরীক্ষা কোরো না, মেশিনের ক্ষতি হতে পারে। এই যন্ত্রের অনেক বিঃ তোমরা জানো না।

কথাগুলো যেন একটু কড়া সুরেই বললেন প্রিয়রঞ্জন। সমীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। প্রিয়রঞ্জন ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রিয়রঞ্জনের জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গেলে সমীর অবজ্ঞাভরে বলে উঠল, হু, জানি। যন্ত্রের অনেক কিছুই জানি না। আপনি ভুল করেছেন ডক্টর প্রিয়রঞ্জন। আমি অনেক কিছুই জানি। কারণ জানাটা আমার প্রয়োজন। আরও—আরও যন্ত্রকে কমপ্লিট করতে হবে। আপনার খ্যাতিকে দ্রুত করার জন্যে নয় স্যার, দরকারটা আমার নিজস্ব। অনেকদিন অপেক্ষা করেছি, আর নয়।

ঠিক এই সময় গ্যারাজের দিকে যেতে যেতে প্রিয়রঞ্জন ভাবছেন, সমীরের কেমন পরিবর্তন দেখছি। কেমন নার্ভাস টেনশনে ভুগছে মনে হয়। আমার কাজ অবশ্য চমৎকার করছে। ভীষণ খাটে। তবু কোথায় যেন গন্ডগোল।

বিশাল জাম্বো জেট প্লেন প্রচণ্ড শব্দে দমদম বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করল। খানিক বাদে যাত্রীর ভিড় লাউঞ্জে ঢুকতে লাগল।

ওয়েলকাম প্রফেসর রজার্স—এক যাত্রীর সামনে এসে অভিবাদন জানালেন। প্রিয়রঞ্জন।

প্রসের রজার্স ছোটখাটো মানুষ। শান্ত, সুন্দর হাসি-হাসি মুখ। পুরু কাচের চশমার পিছনে প্রশান্ত নীল চোখ। মাথাভরা ধবধবে কেশরাশি হাওয়ায় এলোমেলো। চিবুকে একগুচ্ছ শ্বেত শ্মশ্রু। হাতে একটি সুটকেস নিয়ে নিজের মনে এগোচ্ছিলেন তিনি, ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রিয়ার প্রনকে দেখে সোচ্ছাসে চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাল্লো রয়, তুমি এসেছ! আমি দারুণ খুশি হয়েছি। সত্যি বলতে কি, তোমায় আমি এক্সপেক্ট করছিলাম।

কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছে। প্রফেসর রজার্সের ইংরেজিতে অবশ্য একটা অদ্ভুত টান। আসলে হাঙ্গেরির লোক তো, এখন সুইজারল্যান্ডবাসী।

এক্সপেক্ট করছিলেন বুঝি? কিন্তু কই, আমার খোঁজ করলেন না তো! যেমন সোজা এগোচ্ছিলেন!

ওঃ হো! রজার্স বালকের মতো হাসলেন—যখন কাস্টমস চেকিংয়ের জন্যে বাসে আছি, তখন একটা প্রবলেম এল যে মাথায়! সেইটে ভাবতে ভাবতে..

হাসলেন প্রিয়রঞ্জন। সে হাসিতে যুগপৎ কৌতুক ও শ্রদ্ধা। বামভোলা ঋষিতুলা মানুষ এই রজার্স। সর্বদা নিজের চিন্তায় ডুবে আছেন।

তারপর তুমি কেমন আছ, রয়? কী করছ? হঠাৎ চলে এলে কেন কানাডা থেকে? —রজাস প্রশ্ন করলেন।

এই সময় একটি যুবক এসে সামনে দাঁড়াল। ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, আপনি প্রফেসর রজার্স?

হা।—উত্তর দিলেন রজার্স।

আমি সায়ান্স ইন্সটিটিউট থেকে আসছি, আপনাকে নিতে এসেছি। গাড়ি এনেছি। একটু দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন। পথে গাড়ি থাৱাপ হয়েছিল।

স্যার, চলুন না আমার বাড়িতে, লাঞ্চ করবেন। প্রিয়রঞ্জন অনুরোধ জানালেন।

—না, এখন ইন্সটিটিউটে যাই। বিকেল তিনটেয় আমার বক্তৃতা। তুমি এসো ইন্সটিটিউট। লেকচারের পর আড্ডা দেওয়া যাবে। কাল সকালেই যেতে হবে কলম্ব। খুব ভোরের ফ্লাইটে।

প্রিয়রন ভাবলেন, বক্তৃতার পর রজার্সকে একা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, তখন কি আর ওঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে? তিনি বললেন, স্যার, আপনাকে একবার আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

—বাড়ি? সময় হবে কি? খুব জরুরি দরকার নাকি? —হ্যা স্যার।

—বেশ, কারণটা শুনি, তারপর বিচার করব। | প্রিয়রঞ্জন সায়ান্স ইন্সটিটিউট থেকে আসা যুবকের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে বললেন, স্যার, আমরা যদি একটু প্রাইভেটলি কথা বলি..

বেশ, বেশ।—রজার্স অপেক্ষমাণ যুবককে বললেন, ইয়ংম্যান, তুমি একটু অপেক্ষা করো গাড়িতে। আমি আসছি।

রজার্স ও প্রিয়রঞ্জন লাউঞ্জের এককোণে নিরিবিলিতে গিয়ে বসলেন। * বলো কেন বাড়ি নিয়ে যেতে চাও—জিজ্ঞেস করলেন রজার্স।

-স্যার, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখতে চাই। কী জিনিস?

—আমার আবিষ্কার, একটা যন্ত্র।

যন্ত্র? কীসের?

সেই আমি যা নিয়ে রিসার্চ করছিলাম।

-ওঃ, সেই থট-ক্যাচিং মেশিন।

–হ্যা, স্যার। আমি যন্ত্রটা বানিয়ে ফেলেছি। অনেকটা সফল হয়েছি। আপনাকে দেখতে চাই। সফল হয়েছ মানে?—রজার্স খাড়া হয়ে বসলেন।

-মানে, কিছু-কিছু চিন্তাতরঙ্গ আমি রেকর্ড করতে পেরেছি। তবে কয়েক জায়গায় ঠেকে যাচ্ছি। সে সম্বন্ধে আপনার উপদেশ চাই, কারণ রেডিও ফিজিক্সে আপনার চেয়ে বড় এক্সপার্ট আর কেউ নেই।

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন রজার্স। চিবুকের দাড়িতে আঙুল বোলাতে বোলাতে বিষ গলায় বললেন, রয়, তুমি আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে, আমার সহকর্মী ছিলে। তোমার

প্রতিভা, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার খুবই উঁচু আশা! আমার উপদেশ তুমি শুনবে?

—নিশ্চয়ই শুনব। বলুন স্যার।

এ লাইনে রিসার্চ সম্বন্ধে আমি আগেও তোমায় নিরুৎসাহ করেছি, আবার আজ বলছি, আমার উপদেশ, আমার আদেশ, আমার অনুরোধ: এই গবেষণা তুমি বন্ধ করো। এ যন্ত্র তুমি বানিও না।

—স্যার, আপনি এর কেবল মন্দ দিকটাই দেখছেন। ঠিকমতো ব্যবহার করলে এই আবিষ্কার মানুষের সমাজে বিপ্লব আনবে। ঠিকমতো ব্যবহার।শান্তকণ্ঠে বললেন রজার্স, রয় তোমার এই শর্তটা বড় কঠিন। —আপনি আগেই হতাশ হচ্ছেন।

কারণ সে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। বার বার প্রমাণিত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ঠিকমতো ব্যবহার করা হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রাণপাত করে আবিষ্কার করে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করে অন্য লোক। আর সেই লোকগুলো যে ভালো হবে, এমন গ্যারান্টি কই? নিউক্লিয়ার পাওয়ারের আবিষ্কারকরা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, এই গবেষণার ফল হবে। এমন মারাত্মক, তৈরি হবে নিউক্লিয়ার বম্ব? আইনস্টাইন- রাদারফোর্ডরা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন তাঁদের গবেষণার পরিণতি দেখে। একবার আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তা বৈজ্ঞানিকের মুঠোর বাইরে চলে যায়। তার ইচ্ছে, তার উদ্দেশ্য কি আর মানে কেউ? তাই বলছি, এখনও সাবধান হও।

প্রিয়রঞ্জন নতমুখে চুপ করে রইলেন।

রজার্স উত্তেজিতভাবে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, এই গবেষণার জন্যে তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে।

-কেন?

-বুঝছ না? গুপ্তচর বৃত্তির এমন হাতিয়ার দখল করার লোভে সমস্ত পৃথিবী হন্যে হয়ে উঠবে, দেশি-বিদেশি কত লোক, কত রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা ছলে-বলে তোমার কাছ থেকে এই কৌশল ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। তাই বলছিলাম, তুমি

অন্য গবেষণায় মন দাও। তাতে যদি আমার সাহায্য লাগে, আমি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দেব।

আমি যে অনেকদূর এগিয়েছি!

-করুণ সুরে বললেন প্রিয়রঞ্জন। প্রিয়রনের অবস্থা দেখে ভরা রজার্সের কষ্ট হল। তিনি প্রিয়রঞ্জনের পিঠে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন, রয়, আমার থাই যে সত্যি হবে, তা হয়তো নয়।তুমি আরও ভাব, নিজে বিচার করো, তারপর কর্তব্য স্থির করে। অনেক মানুষের পক্ষে বিষ, আবার তা-ই দিয়েই ওষুধও তৈরি হয়। বিষ বলে তার উৎপাদন বন্ধ হয়নি। সুতরাং ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। এখন বিচার্য: কার শক্তি বড় হয়ে উঠবে? সেটা তুমিই ঠিক করো। তুমি বুদ্ধিমান, ঠিক সিদ্ধান্তেই পৌছবে। আজ উঠি। লেগারে এসো। মাইক্রোওয়েভ সম্বন্ধে একটা নতুন জিনিস আলোচনা করব।

অত্যন্ত হতাশা মনে রজার্সকে বিদায় জানালেন প্রিয়রঞ্জন। বুঝলেন, তার এই আবিষ্কারে প্রফেসর রজার্সের প্রবল আপত্তি বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ছয়

মিত্রভবনের মেশিনঘর।

উজ্জ্বল বাতির আলোয় কুঁকে পড়ে একটি ছোট্ট যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করছেন ডক্টর প্রিয়রঞ্জন।

খট-খট! দরজায় টোকা পড়ল।

—আজ্ঞে, আমি বিশু।

এসো, ভেতরে এসো। ভেজানো কপাট ঠেলে ঢুকল এক যুবক। রোগা, ফরসা, পাকানো চেহারা, হাড়-বেরকরা মুখ। সক ছাঁটা শৌখিন গোফ। পরনে শার্ট-প্যান্ট। যুবকের হাবভাব চটপটে। চোখদুটি ক্ষুদ্র এবং চল।। | বোসা। জাস্ট এ মিনিট।-ড্রাইভার দিয়ে একটি স্ক্রু টাইট করতে করতে বললেন। প্রিয়রঞ্জন। বিশু বসল না, বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। কাজ শেষ করে প্রিয়রঞ্জন মুখ তুললেন —তোমায় ডেকেছিলাম।

—হ্যা স্যার।

- কটা টেপ করলে?

—চারটে।

—ট্রাই করেছিলে কটা?

—দুজনকে।

ছ'টার মধ্যে দুটো ব্যর্থ। নট ব্যাড। টেপগুলো বের করো, আমি শুনতে চাই। দেওয়ালের পেরেকে কোলানো একটি চাবি নিয়ে বিশু আলমারি খুলে চারটে ক্যাসেট বের করল। টেপগুলো রাখল প্রিয়রঞ্জনের সামনে।

একটি টেপ তুলে নিয়ে প্রিয়রঞ্জন বালের গায়ে আটকানো লেবেল পড়লেনঃ যুধিষ্ঠির দাস। ভদ্রলোক কে?—তিনি জানতে চাইলেন,

রাস্তার ওপারে লালবাড়ির একতলায় ভাড়া থাকে। পোর্ট কমিশনার্স অপিসের র্ক। আপনি দেখেছেন একে। মাস তিন আগে আপনার কাছে এসেছিল ভাইপোর চাকরির জন্যে দরবার করতে।

—হু, মনে পড়েছে। বেটেখাটো চেহারা। মস্ত সংসার। অভাবী, গোবেচারা লোক।

‘হু—বিশুর ঠোটে চকিতে হাসি ঝিলিক দিল। প্রিয়রঞ্জনের হাতে হেলমেট এগিয়ে দেয় সে। একটা যন্ত্র ফিট খাল টেপটা। হেলমেটের ইলেট্রাডের সঙ্গে যুক্ত তারের শ্লাগ সেই যন্ত্রে লাগাল। প্রিয়রঞ্জন যন্ত্রের গায়ে একটা সুইচ টিপে যুধিষ্ঠির দাসের চিন্তাতরঙ্গ নিজের মস্তিষ্কে গ্রহণ করতে শুরু করলেন। চোখ বুজে তন্ময় হয়ে গেলেন।

পাঁচ মিনিট পরে চোখ মেললেন তিনি। সুইচ অফ করে দিলেন। বললেন, আরে, এ যে সাংঘাতিক লোক! স্মাগলিং করে। দু-দুটো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে। কত লক্ষ টাকা যেন হিসাব কষছিল। জাহাজ থেকে লুকিয়ে কোকেন পাচার করার মতলব ভাজছিল বসে বসে। কী নাম বললে, যুধিষ্ঠির? বাঃ, সার্থকনামা

ব্যক্তি। এ লোকের সঙ্গে বেশি মিশো না হে, বিপদে পড়বে। নাও আর একটা লাগাও।

যুধিষ্ঠির দাসের টেপ খুলে দ্বিতীয় ক্যাসেট হাতে তুলে নিল বিশু। এর পরিচয় কী?—জানতে চাইলেন প্রিয়রঞ্জন।

—লাল সিং। ড্রাইভার, লরি চালায়। চায়ের দোকানের পাশে গ্যারাজে থাকে। খুব লম্বা-চওড়া শিখ। আপনার মোটর খারাপ হতে ডেকে এনেছিলাম। সেই লোক।

-বাস, লোকটা তো সাক্ষাৎ ডাকাত! দেখা যাক ও কী ভাবে? টেপ রেকর্ডার অন করা হল, প্রিয়রঞ্জন চোখ বুজলেন। মিনিটখানেক পরে চোখ খুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কমলি কে? লাল সিংয়ের মেয়ে।বলল বিশু। ফের চোখ বন্ধ করলেন প্রিয়রঞ্জন। মিনিট পাঁচ-ছয় বাদে তিনি চোখ খুলে টেপ বন্ধ করে দিলেন। গভীর বিস্ময়ে বললেন, আরে, লোকটা অদ্ভুত। বদ্রীনাথে এক সাধুর আশ্রমে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। সংসার ত্যাগ করার ইচ্ছে। আবার কমলির কথাও ভাবে।

—হ্যা স্যার, লোকট খুব সাধু-সন্ন্যাসীর ভক্ত। মাঝে মাঝে ডুব মারে, কোনো তীর্থে গিয়ে কাটিয়ে আসে। বলে, "কেবল কমলির জন্যেই সংসার ছাড়তে পারছি না। কমলির বিয়ে হলেই পাহাড়ে চলে যাব।"

—লাল সিংয়ের বউ আছে?

-না, অনেক দিন মারা গিয়েছে। প্রিয়রঞ্জনের প্রশ্নে বিশু আমতা-আমতা করতে থাকে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, হাত দেখাতে বুঝি? ও ভাগ্য-গণনার কথা চিন্তা করছিল বসে বসে।

–আরে হ্যা। আর কত দিন ওকে সংসারে থাকতে হবে জানতে চাইছিল।

–তোমার এ বিদ্যের চর্চা আছে নাকি?

—সামান্য।

প্রিয়রঞ্জন গম্ভীর হয়ে রইলেন। বোঝা গেল, বিশুর গজে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। বিশু মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, এসব হচ্ছে টোপ। এমনি-এমনি কে আর

ড্রইংরুমে আপনার যন্ত্রের সামনে বসবে? তাই নানা টোপ ফেলে নিয়ে আসি। কেউ আসে বিনি পয়সায় চায়ের লোভে, কেউ হাত দেখাতে চায়। বুঝেছি।-মনের মেঘ টে গেল প্রিয়রঞ্জনের - এবার তিন নম্বর লাগাও।নাম কী? —ভবদুলাল ভট্টাচার্য। এই পাড়ারই লোক। আপনি দেখেননি। প্রিয়রঞ্জন মিনিট পাঁচেক তিন নম্বর টেপের চিন্তাতরঙ্গ নিজের মগজে গ্রহণ করে টেপ বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'ভদ্রলোক রেস খেলেন। রেসের মাঠের কথা চিন্তা করছিলেন। গিরিবালা কে?

—ভবনুলালবাবুর স্ত্রী।

—অর্থাৎ ভদ্রলোক স্ত্রীর ভয়ে কাটা, পাছে জানতে পারে। কী করে স্ত্রীকে বাকি দেবেন প্ল্যান ভাজছিলেন। থাক আর নয়। সত্যি, মানুষ কী বিচিত্র জীব। বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না। তাই অন্যের গোপন চিন্তা চুরি করে শুনতে এত রোমাঞ্চকর লাগে। আচ্ছা, এই টেপগুলো কতক্ষণের?

—পাঁচশ-ত্রিশ মিনিটের হবে।

—আরও কম সময় নেবে। চিন্তাতরঙ্গ ধরা পড়লেই আমার শক্ত হবে। কী ব্যাভ শুধু জানা দরকার।

হ্যা, টেপগুলো মুছে ফেলে ফের নতুন সে ট্রাই কোরো।

পরদিন সকালে শশাঙ্কনাথের ফোন পেলেন প্রিয়রঞ্জন : ভাই প্রিয়, আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। জরুরি দরকার।

—কিন্তু আজ যে শনিবার নয়, আমার কাজ আছে। —জানি, জানি।

—ব্যাপারটা কী?

আমাদের অমরের, মানে, অমরেন্দ্র ঘোষের হঠাৎ মেন্টাল ব্রেক ডাউন হয়েছে। তোমার হেল্প চাই।

—আমার সাহায্য কেন? আমি কি ডাক্তার?

-জানি, কিন্তু তোমার সাহায্যই দরকার।

—হঠাৎ মেন্টাল ব্রেকডাউনের কারণ?

—সব আলোচনা করব। আসহ বিকেলে।

কাজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় প্রিয়রঞ্জন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। শশাঙ্ক যখন জেদ ধরেছে, ওকে ঠেকানো যাবে না, আসবেই। কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলও জাগে র্তার মনে। অমরের হলটা কী? তাঁর কাছে কি সাহায্য চায়? অমর তাঁদের কলেজের বন্ধু। এখন বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। অতি শান্ত, ধীর প্রকৃতির।

শশাঙ্কনাথ অমর সম্বন্ধে যা জানালেন, তা সংক্ষেপে এই : অমর আজ দু সপ্তাহ ধরে কলেজে যান না, বাড়িতে থাকেন। অথচ তার ক্লাস আছে। সবশ মনমরা হয়ে থাকেন। কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন না। রাতে ঘুম নেই। ঘরে পায়চারি করেন। তার এই আচরণে কোনো কারণও বলেন না জিজ্ঞেস করলে। কারণ একটা অনুমান করা গিয়ে, অমরের কলেজে এক কাণ্ড ঘটেছে। ইতিহাস অনার্স টেস্ট পরীক্ষার পর জানা যায় যে, সেকেন্ড পেপারের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ওই প্রশ্ন করেছিলেন অমর। কলেজে এই নিয়ে অমর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তিক্ত সমালোচনাও হয়েছে, যদিও তা বেশিদূর গড়ায়নি। শশাঙ্কনাথের ধারণা, এই ঘটনাই অমরের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ।

জানিস তো অমর কেমন সেন্টিমেন্টাল।—শশাঙ্ক জানিয়েছেন—আত্মসম্মানজ্ঞান কী টনটনে। আমার ভয় হচ্ছে, ও একটা কিছু না করে বসে।

কী করবে?—শুধোলেন প্রিয়রঞ্জন।

—যদি সুইসাইড করে বা চাকরি ছেড়ে দেয়।

—ভেরি ব্যান্ড। কিন্তু আমি কী করতে পারি?

ধ, তোর মেশিনের সাহায্যে ওর মনের কথা জেনে নেওয়া যায় না? তাহলে একটু হদিশ পাওয়া যায়। তখন সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

—কিন্তু ওর চিন্তা যদি রেকর্ড করা না যায় ? যদি ধরা না পড়ে?

চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

—বেশ। তাহলে অমরকে আমার ড্রইংরুমে এনে বসাতে হবে।

—অমর তো এমনিতে বাড়ির বার হচ্ছেই না। তুই চল্ আমার সঙ্গে ওর বাড়ি। ছুতোনাতা করে ওকে এখানে একবার নিয়ে আসি। তুই রিকোয়েস্ট করলে ও না করতে পারবে না।

বেশ, দেখা যাক।—রাজি হলেন প্রিয়রঞ্জন।

পরদিন রবিবার সকালে শশাঙ্ক ও প্রিয়রঞ্জন মানিকতলায় অমরেন্দর বাড়ি হাজির হলেন।

অমরেন্দ্র এলেন। বিষম ভাব, অবশ্য ভদ্রতায় ত্রুটি নেই তার। তবে বেশি কথা বলতে যেন অনিচ্ছা।

প্রিয়রঞ্জনের সেসবে গ্রাহ্য নেই, অমরের হাবভাব খেয়ালই করলেন না তিনি। দু'কথার পরই জিজ্ঞাসা করলেন, কী নিয়ে কাজ করছিস? অমরেন্দ্র দ্বিধাভরে বললেন, এই ভূঁইয়া প্রতাপাদিত্য নিয়ে একটু খোঁজ-খবর করছি।

—নতুন ইন্টারেস্টিং কিছু পেলি?

—পেয়েছি। কী রকম? প্রিয়রঞ্জন উৎসুক।

অমরেন্দ্র বলতে থাকেন। একটু-একটু করে তিনি সহজ হয়ে ওঠেন। প্রিয়রঞ্জন প্রশ্ন করেন মাঝে মাঝে। নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে পেরে আর আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে অমরেন্দ্রের চোখ-মুখ উল হয়ে ওঠে। শশাঙ্কনাথ উসখুস করছেন। এসব আলোচনায় বেচারা থই পান না। লুকিয়ে চোখ

টিপছেন প্রিয়কে: এই সুযোগ, 'অনরকে নেমন্তন্ন করে ফে। কিন্তু প্রিয়রঞ্জনের তাতে আক্ষেপ নেই। শশাঙ্কনাথ বার দুই অপর থেকে ঘুরে এলেন, অমরের স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে দেখা করে এলেন। চা-জলখাবার এল।

বাংলার বারো ভূঁইয়া ও প্রতাপাদিত্য নিয়ে মশগুল হয়ে আলোচনা ছেন দু'জনে। হঠাৎ বললেন, অমর, শুনলাম, তোমার নাকি মন খারাপ? কোয়েশ্চেন আউট হয়ে গিয়েছে, 'তাই।

অমর থতমত খেয়ে গেলেন। প্রিয় বললেন, আরে দূর, তাতে মনখারাপের কী আছে?

—এ তো আজকাল আকছার হচ্ছে। তুমি তো আর নিজে বলোনি কাউকে!

—না, কক্ষনো না।

—তবে নিশ্চয়ই কেউ চুরি করে জেনেছে। অতএব তোমার এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে?

অমর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমার মন খারাপের কারণটা অন্য।

—প্রশ্ন, কেউ চুরি করে জেনেছে। কিন্তু কে সে? সেই উত্তরটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

-মানে?

প্রশ্নটা করে আমি একটা খাতা চাপা দিয়ে টেবিলের ওপরে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। কাজটা উচিত হয়নি। বলতে পারি, কেয়ারলেস হয়েছি। ফাইলের ভিতরে রাখা উচিত ছিল। তবে এরকম আগেও রেখেছি, কোনো অঘটন ঘটেনি। ঘণ্টা দুই পরে আমি ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল দু'জন। আমার ছোট ভাই সনৎ এবং আমার এক ছাত্র তপন। আমার বোন, মাও ঢুকে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে চটপট প্রশ্নটা কপি করে ফেলা সম্ভব নয়। যদি বাড়ি থেকে আমার প্রশ্ন ফাস হয়ে থাকে, তবে সে কাজ সনৎ বা তপনের।

—তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করছ না কেন?

এইখানেই মুশকিল। দু'জনকেই আমি স্নেহ করি, বিশ্বাস করি। তারাও আমার শ্রদ্ধা করে। এত বড় সন্দেহটা তাই মুখ ফুটে বলতে পারছি না। ধর, যদি ওরা নির্দোষ হয়, কী ভাববে? ওদের সম্বন্ধে এমন জঘন্য সন্দেহ আমার মনে এসেছে, এ কথা ভেবে আমার ওপর ওরা সব শ্রদ্ধা হারাবে। ওদের মনে কতবড় আঘাত দেওয়া হবে, ভেবে দেখ।

—হয়তো কোয়েশ্চেন প্রেস থেকে আউট হয়েছে, প্রেসের লোক টাকা খেয়ে বের করে দিয়েছে।

হতে পারে। তবে আর কোনো প্রশ্ন আউট হল না, শুধু আমারটা। আর ওই প্রেস খুব বিশ্বাসী। অনেক বছর ওখানে আমার প্রশ্ন ছাপাচ্ছি, কখনও কোনো গোলমাল হয়নি। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রশ্ন আমার বাড়ি থেকেই বেরিয়েছে। উঃ, এ যে কী সমস্যা। কিন্তু অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত। তাই শান্তি পাচ্ছি না।

প্রিয়রঞ্জন ও শশাঙ্কনাথ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কোনো কথা জোগাল না তাদের মুখে।

অমরে সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, এসব কথা এখন থাক। প্রিয়, তুমি অনেকদিন পর এসেছ, মিছিমিছি বিব্রত করলাম তোমায়। আমার সমস্যার সমাধান আমি ঠিকই একদিন করব। যাক, সেদিন ফিরলে কখন? কবে?— জিজ্ঞেস করলেন প্রিয়রঞ্জন।

—যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তুমি বাড়ি ছিলে না!

–তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে কোথায়?

–কেন, তোমার বাড়িতে। সিথির কাছে।

– সে কী! কদিন আগে?

-হপ্তাতিনেক হবে। কেন, কেউ বলেনি তোমায় ?

—আমি তো ভাবছিলাম, তাই তুমি এসেছ আজ। তুমি আমার ঠিকানা পেলে কী করে?

শশাঙ্ক বলেছিল। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার খবর। ও বলল, তুমি ফিরেছ। বাড়ির ঠিকানা দিল।

শশাঙ্কনাথ ঘাড় নেড়ে অমরেন্দ্র কথার সমর্থন জানালেন। অমরেন্দ্র বললেন, স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউটে গিয়েছিলাম একটা কাজে। ভাবলাম, কাছেই থাক তুমি, দেখা করে যাই। তুমি সেদিন বিকেলে ছিলে না। খানিক অপেক্ষা করে চলে

এলাম। ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব। তারপরই কলেজে এই কাণ্ড! সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার বাড়ি কে ছিল তখন?—প্রিয়রঞ্জন জানতে চাইলেন।

একটি ছেলে। কালো, লম্বা। আমায় বসাল ড্রইংরুমে। -তারপর?

—আধঘন্টাটাক অপেক্ষা করে উঠে পড়লাম।

—সেদিন 'আমার ড্রইংরুমে বসে তুমি কি ওই প্রশ্নগুলো ভাবছিলে?

–হ্যা, ঠিক বলেছ। কী করে বুঝলে? অনার্সের টেস্ট আরম্ভ হবে দু'দিন পরে। বসে বসে ভাবছিলাম আমি কী কী কোয়েশ্চেন সেট করেছি।

এর পরেই প্রিয়রঞ্জনের ভাব গম্ভীর হয়ে গেল। একটুক্ষণ পরেই বললেন, আজ উঠি।

বাড়ি ফিরেই প্রিয়রঞ্জন সমীরের খোজ করলেন। সমীর মেশিনঘরে ছিল। মেশিনম্বরে ঢুকে দু-একটা আজে-বাজে কথার পর প্রিয়রঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, সমীর, দিন পঁচিশেক আগে এক শুক্রবার আমার সঙ্গে দেখা করতে একজন এসেছিলেন। পাতলা, ফরসা, মাঝারি হাইট। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। আমার দেখা না পেয়ে চলে যান। তুমি তাকে বসিয়েছিলে?

-হ্যা, স্যার। প্রফেসর অমরেন্দ্র ঘোষ।

তুমি চেনো অমরকে?

আজ্ঞে চিনি। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে এক সভায় দেখেছি ওঁকে বক্তৃতা করতে।

—অমরকে ড্রইংরুমে বসিয়েছিলে?

—হা।

—তুমি তার চিন্তা রেকর্ড করেছিলে?

না, স্যার।

অমরের কথা আমায় বলেনি কেন?

ভুলে গিয়েছিলাম স্যার। প্রিয়রঞ্জনের সুকুটি স্পষ্ট হয়। সমীরকে বেশ নার্ভাস দেখাল। বলল, আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার। ওঁকে বসিয়ে রেখে নিজের ঘরে একটা বই পড়ছিলুম। খুব জমে গিয়েছিলাম বইটায়। খানিক বাদে এসে দেখি, উনি কখন চলে গিয়েছেন। উনি নিজের পরিচয় দেননি, আপনার সঙ্গে যে কোনো জরুরি কথা আছে তাও বলেননি, তাই ওঁকে নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি।

বাড়িতে তখন আর কে কে ছিল?

—বিশু আর বংশী।

—বিশু অমর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?

—হু। জিজ্ঞেস করল, "ভদ্রলোক কে?"

আমি পরিচয় বলেছিলাম।

–বিশু কি ওর সেরিব্রাল ওয়েভ রেকর্ড করেছিল?

—জানি না স্যার। আমি নিজের ঘরে ছিলাম। হুম্।

—প্রিয়রঞ্জন বেরিয়ে গেলেন।

প্রিয়রঞ্জনের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তার ঘূর্ণি। অমরের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার জন্যে দায়ী কে? অমরের ভাই, ছাত্র, না, তার যথ? সেদিন অমরের চিন্তা কি কেউ চুরি করে রেকর্ড করেছিল? শুধু লুকিয়ে রেকর্ড করা নয়, সেই গোপন চিন্তাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহারও করা হয়েছে। এ কার কীর্তি-সমীর, না, বিশুর? সমীর কি সত্যি কথা বলছে। বিশু এখন নেই এখানে, ব্যাঙ্গালোর গিয়েছে। এর সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত। তার অ্যাসিস্টান্টদের মধ্যেই কেউ কি এমন বিশ্বাসঘাতক, দুষ্টপ্রকৃতির? অমরেন্দ্রর মতোই প্রিয়রঞ্জনও তীক্ষ দ্বিধা ও সন্দেহের খোচায় জর্জরিত হতে থাকেন!

পাঁচদিন ধরে সমীর মিত্রভবনে অনুপস্থিত। কোনো খবর অবধি নেই।

প্রিয়রঞ্জন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এমন তো হয় না কখনও। সমীরের কি অসুখ করেছে? কিংবা অমরের প্রশ্ন ফাস হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই এর কারণ? তবে কি সমীরই দোষী? প্রিয়রঞ্জন সন্দেহ করছেন বুঝে এখন সে গা-ঢাকা দিয়েছে? সমীরের বাড়ি গিয়ে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।

কলকাতায় বাগবাজার অঞ্চলে সরু গলির মধ্যে এক মস্ত পুরনো বাড়ির একতলায় সমীরের বাস। তিনখানি ঘর নিয়ে ভাড়া থাকে। বাড়িতে অন্য প্রাণী বলতে তার মা এবং ছোট বোন। সমীরের সাংসারিক পরিচয় এইটুকুই জানেন প্রিয়রঞ্জন।

সমীরের বাসা খুজে বের করতে প্রিয়রঞ্জনকে রীতিমতো বেগ পেতে হল। বাইরের দরজায় কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে উকি মারল একটি মেয়ে। প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

মেয়েটির মুখের আদল সমীরের মতো। নিশ্চয়ই ওর বোন। প্রিয়রঞ্জন বললেন, সমীর আছে? আমি প্রিয়রঞ্জন রায়।

চকিতে তরুণীর মুখে সম্ভ্রম ফুটে ওঠে। দরজা খুলে এক পা এগিয়ে এসে বলল, ও, আপনি। 'আসুন ভিতরে। আমি রেবা। সমীর আমার দাদা।

—আছে সমীর? আছে।

—ঘাড় নাড়ল রেবা।

-কী ব্যাপার? ও যাচ্ছে না কেন? অসুখ করেছে?

মানে, 'আসুন ভিতরে। সব বলছি।

রেবার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। সে দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রিয়রঞ্জনকে ঢোকার পথ করে দিল। সামনের ছোট ঘরখানিতে বসালেন প্রিয়রঞ্জন। খুবই সাদাসিধেভাবে সাজানো। কয়েকটি কাঠের টেবিল, চেয়ার। দেওয়াল ঘেঁষে ছোট এক তাপোশ, তার ওপর শতরঞ্চি বিছোননা। এককোণে একটা লেখার টেবিল, তাতে কিছু খাতা-বই। দেওয়ালের তাকে ঠাসা বই, কতকগুলি গল্পের, বাকি বিজ্ঞান বিষয়ের। দেওয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা ছবিটি। অনাড়ম্বর দিন-যাপনের

ছাপ, সুরুচির পরিচয় মেলে। রেবা সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। কই, সমীরাকে ডাক।—অধৈর্যভাবে বললেন প্রিয়রঞ্জন। দাদা হঠাৎ...দাদার কী যেন হয়েছে?

—ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল রেবা। কী হয়েছে? —প্রিয়রঞ্জন বিস্মিত।

—দাদা কদিন ধরে গুম হয়ে থাকছিল। কলেজে যেত না, আপনার ওখানেও যেত না। আমি, মা বারবার জিজ্ঞেস করেছি, "শরীর খারাপ?" উত্তর দিত না। বেশি জিজ্ঞেস করলে রেগে উঠত। তবে ওর জ্বর-জ্বালা হয়নি, এটা ঠিক। গত পরশু দাদার এক বন্ধু আসেন দেখা করতে। মানিকদা, দাদার অনেকদিনের বন্ধু। খুব ভালো লোক। সাদাকে খুব ভালোবাসেন। দাদা এই ঘরে বসেছিল। আমি আর মা ভিতরে ছিলাম। একটু পরেই শুনি দাদার গলাঃ "বেরিয়ে যাও। এক্ষুণি বেরিয়ে যাও!" ছুটে গিয়ে দেখি, দাদা থরথর করে কাপছে রাগে, চোখ-মুখ লাল, মানিকণা হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে। মানিকদা কী যেন বলার। চেষ্টা করলেন, দাদা অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "কোনো কথা নয়। জোচ্চোর। ভণ্ড। বেরোও। আমি সব জানতে পেরেছি। গেট আউট।" মানিকদা মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। দাদা তারপর পাথরের মতো বসে রইল ঘণ্টাখানেক। মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কী করেছে মানিক?" দাদা বলল, "কিছু না।" জানেন তো এমনিতে দাদার মেজাজ কত ঠান্ডা। কেন চটল, কিছুই বুঝলাম না। এরপর থেকে দাদা বাড়িতে। নিজের ঘরে পোর বন্ধ করে থাকে প্রায় সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। এমন করলে দাদা ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

বলতে বলতে রেবার চোখে জল এসে গেল। প্রিয়রঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক, মনে হচ্ছে, অমরের প্রশ্ন-চুরির কারণে সমার ডুব মারেনি। কারণ অন্যর সঙ্গে রাগারাগি। তিনি বললেন, সমীরকে ডানে, বলো, আমি এসেছি।

রেবা ভিতরে চলে গেল।

স্যার আপনি?—মিনিট দুই বাদে সমীর ঘরে ঢুকল। চোখ বসা, শ্রান্ত চেহারা অপ্রস্তুত কুণ্ঠিত 'ভার।

বোসো সমীয়। সহজ সুরে বললেন প্রিয়রন। সমীর জড়সড় হয়ে বলল। কোনো ভনিতা না করে প্রিয়রঞ্জন বললেন, বন্ধুকে দেখে মাথা গরম করেছিলে কেন? রেবা বলল।

সমীর অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, স্যার, আমি যে কী ভীষণ আঘাত পেয়েছি কেউ জানে না! এই মানিক আমার কত দিনের বন্ধু, ওকে বিশ্বাস করতাম, ভালোবাসতাম। আর ও-ই কিনা আমার সেই অপমানের জন্য দায়ী? উঃ, কী মিটমিটে শয়তান! আমি ভাবতে পারিনি।

একটু খুলে বল ব্যাপারটা।—প্রিয়রঞ্জন অনুরোধ করলেন।

সমীর ধীরে ধীরে বলতে লাগল: জানেন স্যার, এম. এস-সি পড়ার সময় একটা মেসে থাকতাম। ওই মেসেই থাকত মানিক। ওর সাবজেক্ট ছিল হিস্ট্রি। আমার ফিজিক্স। তবু খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল দু'জনের। অবশ্য দু'জনে এক ঘরে থাকতাম না। মানিকের অবস্থা 'ভালো ছিল না, আমার চেয়েও খারাপ। ও থাকত নিচের তলায় একটা কমভাড়ার ছোট্ট, ঘরে, আমি থাকতাম দোতলায়। আমার ঘরে চারটে সিট ছিল, তবে ঘরটায় আলো-বাতাস খেলত বেশ। ঘর আমিই একমাত্র পড়ুয়া, অন্য তিনজন চাকুরে। তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ বনত না। বোধহয় নিজেরা অল্প শিক্ষিত হওয়ার ফলে আমাকে ওরা একটু বাঁকা চোখে দেখত। সময়-অসময়ে অল্প-বিস্তর ঠাট্টা-বিক্ষপ করত। আমি গায়ে মাখতাম না। ঘরটা ভালো, কাছেই বাথরুম, স্নানের ঘর। এইসব সুবিধের দরুন সিটটা পালটাবার চেষ্টা। করিনি। মানিক প্রায়ই এসে বসত আমার খাটে। গল্প-গুজব করতাম। পরীক্ষার মাসতিনেক আগে আমার ঘরে এক কাণ্ড হল। আমার পাশের সিটের ভদ্রলোকের পাঞ্জাবি ঝুলছিল তার আলনায়, জামার পকেটে অনেক টাকা ছিল। পকেটের টাকা বালো তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। বিকেলে খোজ পড়ল টাকার। দেখা গেল, নেই। খোঁজাখুঁজির পর কী আবিষ্কার হল জানেন? আমার বিছানার তোশকের তলা থেকে বেরোল সেই টাকার গোছা। লজ্জায় মরে গেলাম। বারবার দোষ অস্বীকার করলাম। মেসের বেশির ভাগ লোক অবশ্য আমাকে নির্দোষ মনে করল। তবু কিছু লোকের মনে সন্দেহ নাইল —বিশেষ করে, আমার ঘরের অন্য তিন মেম্বারের। সেটা তাদের হাব-ভাব দেখে টের পেতাম। তারা বাক্সে ডবল তালা লাগাল। প্রতিদিন ঘরে ঢুকে আলনার কাপড়-চোপড় গামছা অবধি গুনে গুনে দেখে। কথাবার্তা বলে না আমার সঙ্গে। কেবল আড়চোখে লক্ষ করে আমায়। এমনকী মানিকও আমার ঘরে আসা বন্ধ করে দিল। তখন ভেবেছিলাম, 'ভয় পেয়েছে, আমার দুর্নামের ভাগী হতে চায় না। অবশ্য ও বারবার আমায় বলেছিল, ও কখনো বিশ্বাস করে না, এ আমার কাজ, এ কাজ নিশ্চয়ই অন্য কারও। এ কীর্তি কার, এ প্রশ্নের উত্তর আমিও খুঁজছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ কাজ আমার তিন রুমমেটের কারও। তার হাত

ষড়যন্ত্র করে আমায় অপদস্থ করেছে। কিছুদিন ধরেই ওরা আমায় ওই ঘর থেকে তাড়াতে চাইছিল। আমার জায়গায় ওদের এক বন্ধুকে ঢোকাবে। তাহলে রাতে বাজি রেখে তাস খেলা জমবে। মিথ্যে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। লজ্জায়, গে, gণায় অস্থির হয়ে উঠলাম। শেষে ওই মেস ছেড়ে দিলাম। সস্তা মেস পাওয়া কঠিন। একটা জঘন্য মেসে কোনোরকমে একটু জায়গা পেলাম। পড়াশোনা মাথায় উঠল। ফলে ফাইনাল পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট অনেক খারাপ হয়ে গেল।

একটু থেমে সমীর আবার বলে চলে: জানেন স্যার কদিন আগে কী আবিষ্কার করেছি—আমার সেই চরম লাঞ্ছনার জন্যে দায়ী আমার প্রিয় বন্ধু মানিক। ও-ই আমার বিছানার নিচে 'টাকাটা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল। এর পর মানুষের ওপর, বন্ধুত্বের ওপর আমার সব বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু কেন ও আমায় এমন অপদস্থ করেছিল, তার কারণটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

-আদ্দিন পরে এমন আবিষ্কারটি করলে কী করে? প্রিয়রঞ্জনের প্রশ্নে থতমত খেল সমীর। বলল, ইয়ে ... মানে... আপনার যন্ত্রের সাহায্যে। ঘুম। মাথা নাড়লেন প্রিয়রঞ্জন—এত দিন রাগ পুষে রেখেছিলে? আশ্চর্য!

—না, ঠিক পুষে রাখিনি, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার চিন্তাগ্রাহক যত্ন নিয়ে কাজ করতে করতে ভাবলাম, জানতে চেষ্টা করি, কে আমায় সেদিন অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

মানিককে সন্দেহ করলে কেন?

—একেবারেই করিনি। আমার সন্দেহ ছিল সেই তিন রুমমেটের ওপর। ছল ছুতোয় তাদের একজনকে এনেছিলাম যন্ত্রের সামনে। কিন্তু তার চিন্তাতরঙ্গ ধরতে পারল না মেশিন। রোথ চেপে গিয়েছিল, প্রকৃত অপরাধীকে আবিষ্কার করব। তারপর তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেব। শোধ তুলব। মানিকের চিন্তা রেকর্ড করেছিলাম স্রেফ মজা করার জন্যে। কিন্তু তার বদলে এ কর্মী জানলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমার অপমানের জন্যে দায়ী লোককে খুজে বের করার চেষ্টা না করলেই ভালো ছিল। তাহলে আমার মনের শান্তি এ ভাবে নষ্ট হত না। ভুলেই তো গিয়েছিলাম। ওঃ! দু' হাতে কপাল চেপে মুখ নামিয়ে বসে রইল সমীর। প্রিয়রঞ্জনও ভাষাহীন, মূক।

সমীর! ডাক শুনে সমীর চমকে বাইরে তাকাল। আধ-ভেজানো দরজায় এক যুবক উদ্ভ্রান্তের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ, ছোটখাটো চেহারা। পরনে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি। মানিক! —বলে সমীর তার সামনে গিয়ে দাড়াল।

মানিক আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, সমীর, আমার কথা একবার শোন। তারপর আমায় যা ইচ্ছে শাস্তি দিস। আমি এজ ইচ্ছে রে করিনি ভাই।

প্রিয়রঞ্জন গলাখাকারি দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিলেন। প্রিয়রঞ্জনকে লক্ষ করে মানিক ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল।

সমীর বলল, উনি ডক্টর প্রিয়রঞ্জন রায়। ওঁর সামনে বলতে পারিস। উনি সব জানেন। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে মানিক বলতে লাগল: সেদিনকার ঘটনা তোর মনে আছে সমীর? আমায় বিছানায় বসতে বলে তুই স্নান করতে গেলি। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার নজর পড়ল কৃপাসিন্ধুকুর সিটের পাশে দেওয়ালে কোলানো একটা পাঞ্জাবির বুকপকেটে। ফিনফিনে আব্দির পাঞ্জাবির ভিতরে পকেটা ফুলে উঠেছে, আবছা দেখা যাচ্ছে নোটের গোছা। আমার তখন কী অবস্থা যাচ্ছে না করতে পারবি। তিন মাস হল, বাড়ি থেকে একটি পয়সাও আসেনি। বাবার অসু, বিনা মাইনেয় ছুটি নিয়েছেন, কেবল কুড়ি টাকার টিউশনিট মাত্র সম্বল। চারিদিকে ধার। মেসের ম্যানেজার বারবার তাগাদা দিচ্ছে: ‘টাকা দাও। নইলে মেস ছাড়তে হবে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। ঘরে কেউ নেই। টপ করে তুলে নিলুম নোটগুলো। তখুনি ঘরে ছেড়ে পালিয়ে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় বাইরে শুনলাম কৃপাসিন্ধুবাবুর গলা। ভাবলাম, উনি ঠিক টাকার খোঁজ করতে এসেছেন। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে টাকাটা গুজে দিলাম তোর বিছানার তলায়। শুধু নিজেকে বাঁচাবার চিন্তাই তখন মনে এসেছিল। এর ফলে তোর যে বিপদ ঘটতে পারে মাথায় আসেনি।

একটু দম নিল মানিক। তারপর বলতে লাগল: কৃপাসিন্ধুবাবু ঢুকলেন। একটি খাতা বের করে দেখলেন। কিন্তু টাকার খোঁজ করলেন না। বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তুই এসে পড়েছিস! ভাবছিলাম, তোকে কোনো ছুতায় সরিয়ে দিয়ে টাকাটা ঠিক জায়গায় রেখে দেব। টাকা চুরির সাহস তখন আমার উবে গিয়েছে। কিন্তু হায়, সুযোগ পেলাম না। আবার তোদের ঘরের মেম্বাররা যখন থাকে না, তখন ওই ঘর থাকে তালা বন্ধ। লুকিয়ে ঢোলর সুযোগ নেই। কলেজে গেলাম তোর সঙ্গেই। সারা দুপুর কী অশান্তিতে যে কাটল! কিন্তু উপায় খুঁজে পেলাম না। বিকেলে মেসে ফিরে দেখি, হুলস্থুল কাণ্ড চলছে। তারপর...

কান্নায় মানিকের গলা বুজে এল। খানিক চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আমি কাওয়ার্ড, কাপুরুষ, স্বার্থপর! কেন স্বীকার করতে পারলাম না নিজের দোষ? এত বড় অপমানের বোঝ তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম। পরেও বারবার ভেবেছি, সব স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। পারিনি ভয় হয়েছে, চিরকালের মতো তোর বন্ধুত্ব যদি হারাই! হয়তো তুই সে ঘটনা ভুলে গিয়েছিস! পুরনো বিষাক্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার দরকার কী? এও ভয় হয়েছে, তুই হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবি না, ভুল বুঝবি। উঃ, কী অনুশোচনায় যে ভুগেছি! যাক, এখন সব স্বীকার করলাম, ক্ষমা চাইছি। যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলিস, করব।

উন্মুখ হয়ে সমীরের দিকে চেয়ে রইল মানিক।

সমীর মৃদু কোমল স্বরে বলল, তোর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। এবার আমার ক্ষমা চাওয়ার পালা। সেদিন আমার উচিত ছিল আগে তোর কথা শোনা। তোর এত ভালোবাসা কী করে একমুহূর্তে ভুলতে পারলাম ভাবতে পারছি না। আমি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমায় মাপ করো ভাই!

মানিকের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। বলল, একদিন বারবার ভেবেছি, আত্মহত্যা করব। তোর ক্ষমা না পেলে হয়তো তা-ই করতাম। উঃ, আমার এতদিনের যন্ত্রণা থেকে আজ মুক্তি পেলাম।

এবার চলি আমি।

প্রিয়রঞ্জনের কণ্ঠ। দুই বন্ধু সম্বিৎ ফিরে পেল। সমীর, লজ্জিতভাবে বলল, আপনার অনেক কাজের ক্ষতি হল স্যার, আমি কাল থেকে যাব!

কালই দরকার নেই। দুদিন রেট নাও। তোমায় খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে, বললেন প্রিয়রঞ্জন।

বাড়ি ফেরার পথে প্রিয়রঞ্জন সারা সময় গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন।

আট

সমীরের সঙ্গে প্রিয়রঞ্জন যেদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন সেইদিনই বিকেলে শশাঙ্কনাথ মিত্রভবনে এসে উপস্থিত। মহা উত্তেজিতভাবে বললেন, কথা আছে,

দারুণ খবর!

এসো। –শশাঙ্ককে প্রিয়রঞ্জন নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে বসালেন —কী ব্যাপার? তোমার বিশু একটা স্কাউনড্রেল!—বললেন শশাঙ্কনাথ।

কয়েকদিন ধরে আমি মিত্রভবনের কাছাকাছি পাড়াগুলোয় বিশু সম্বন্ধে খোঁজ-খবর। করলাম। কাছেই আমার এক ভগ্নীপতি থাকে। বঙ্কিমবিহারী। তাই কাজটা একটু সহজ হল। বঙ্কিমের সঙ্গেও বিশুর আলাপ আছে। অবশ্য তোর মেশিন সম্বন্ধে কোনো আভাস দিইনি। ঘুরে ঘুরে কী জানলাম জানি, বিশু এখানে গাদা লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে এবং বিশু এখানে একজন জ্যোতিষী হিসাবে ফেমাস। যেখানে-সেখানে ও হাত দেখে না, মক্কেলদের তোর ড্রইংরুমে গিয়ে গিয়ে বসিয়ে হস্ত, ললাট ইত্যাদির বিচার করে। তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদেরও অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে এমন সব গোপন কথা বলে দেয় যে, লোকে কুপোকাৎ! লোকে ভবিষ্যতের কথাও জানতে চেয়েছে। সে বিষয়েও অনেক ইঙ্গিত দিয়েছে শ্রীমান বিশু। এরপর ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায়। অনেকে তার কাছে ব্যবস্থা চেয়েছে। বিশু তাদের কাছে বিক্রি করেছে নানা রত্ন-পাথর বাজার-দরের চেয়ে ঢের বেশি দামে, অর্থাৎ প্রচুর লাভ করে নিয়েছে। কাউকে কাউকে আংটি-মাদুলিও গছিয়েছে অবশ্যই পয়সা নিয়ে। বিশুর খ্যাতি হু হু করে বাড়ছে। শুধু এপাড়া নয়, ইদানীং বাইরে থেকেও লোক আসছে তার কাছে হাত দেখাতে। আমি খোজ নিয়ে জেনেছি, এখানে আসার আগে জ্যোতিষী হিসাবে ওর কোনো নাম-ডাক ছিল না। আমার ধারণা, তোর এই অ্যাসিস্ট্যান্টটি তোর চিন্তা-চুরি-যন্ত্রের ঘাড় ভেঙে বেশ দু'পয়সা। কামিয়ে নিচ্ছে। সত্যি হাত-টাত দেখতে জানে, না, কচু! নইলে শুধু তোর ড্রইংরুমে এনে। হাত দেখবে কেন? ওখানে অ্যানটেনার সাহায্যে লোকের চিন্তা চুরি করে রেকর্ড করে। তাদের অতীত-বর্তমানের দু-চারটে গোপন কথা বলে তাক লাগায় সে। কাউকে কাউকে। নাকি বলেছে, এখন দেখব না, কয়েক মাস পরে বলব!" ওঃ, কী ঘড়েল ছোকরা!

প্রিয়রঞ্জন বললেন, আমি বিশুকে কিছু পাড়ার লোক এনে তাদের থট ওয়েভ রেকর্ড করতে বলেছিলাম। হাত দেখার কথা ও স্বীকার করেছিল। বলেছিল, এ বিদ্যে ও সামান্য জানে। এই লোভ দেখিয়ে ড্রইংরুমে লোক ডেকে আনে। কিন্তু পাথর-টাথর দেওয়া, এ আমি ভাবতেও পারিনি। আট-দশটা সেরিব্রাল ওয়েভ-এর রেকর্ডও আমায় ও শুনিয়েছে।

জানতাম না এত লোক এনেছে। সকালে আমি বা সমীর কে খাকিন, বুকেছি তখন ও আরও আছে শ্রীমানের কীর্তি, আরও আছে-শশাঙ্কনাথ বললেন, আমার সন্দেহ অমরেন্দ্রর হিস্ট্রির কোয়েশ্চেন বিশুই আউট করেছে। আমি জেনেছি, অমরের কলেজে বিশুর এক মামাতো ভাই পড়ে। সে টেস্ট দিয়েছে এবং হিস্ট্রি ছিল। আর ওই ছোকরা যে হোস্টেলে থাকে, সেখান থেকেই প্রথম অমরের প্রশ্ন আউট হয়। খুব সম্ভব বিশু অভ্যাসবশত অমরের চিন্তা রেকর্ড করে। পরে গেয়েশেনগুলো পেয়ে ভাইকে বলে দেরা।

প্রিয়রঞ্জনের মুখ অন্ধকার হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক বলেন, আরও শুনবি? বিশু ছোকরা শুধু হাত দেখার নাম করেই পয়সা কামাচ্ছে না, ব্ল্যাকমেল করছে।

কী রকম?

—আমার ভগ্নীপতি বঙ্কিম এখানে সজ্জন লোক বলে পরিচিত। ছোটখাটো ছাপাখানার ব্যবসা আছে। অমায়িক, পরোপকারী। এখানকার স্কুলের ভাইসপ্রেসিডেন্ট। বাইরের কথা বলছি না, আমি নিজেও জানি, ওর মনটা সত্যিই উদার। বঙ্কিম এবার এখানে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্যে দাঁড়াবে ঠিক করেছে। কিন্তু ও এক সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। কেউ ওকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছে।

এর সঙ্গে বিশুর সম্পর্ক কী?—অধৈর্যভাবে বললেন প্রিয়রঞ্জন।

-বলছি, বলছি। বঙ্কিম অল্প বয়সে ছিল বেপরোয়া ধরনের। তখন লখনউতে ছিল কিছুদিন। একদল খারাপ লোকের সঙ্গে মেশামেশি লত। তখন এক জুয়ার আড্ডা থেকে। ওকে পুলিশে ধরে। এক মাস জেল খাটতে হয়েছিল ওকে। ভীষণ জয় পেয়েছিল। মায়ের পা ধরে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনও কুসঙ্গে মিশবে না। প্রতিজ্ঞা ও রেখেছে। অনেক চেষ্টায় আজকের এই প্রতিষ্ঠা আর সুনামটুকু অর্জন করেছে। কিন্তু মাসকয়েক আগে ওর কাছে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির চিঠি আসে। তাতে ভয় দেখানো হয়, প্রতি সপ্তাহে দুশো টাকা করে না দিলে তার পুরনো পাপের খবর সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। চিঠি পাওয়া ইস্তক ভয়ে কাটা হয়ে আছে বঙ্কিম। বাড়িতে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী কাউকে জানায়নি লজ্জায়। এ কথা জানাজানি হলে সমাজে তার মুখ দেখানো ভার হবে, বাড়ির লোরে কাছেও মাথা হেট হয়ে যাবে। চেয়ারম্যান দাঁড়ানোও হবে না। হপ্তায় হপ্তায় সে তাই টা দিয়ে চলেছে। শ্যামবাজারে এক পানের দোকানে টাকাটা জমা দিয়ে আসতে হয়।

আমাকে সে খুব ভালোবাসে। আর থাকতে না পেরে আমায় বলে ফেলেছে সব। এবং —

শশাঙ্কনাথের কথার স্রোত ছামিয়ে দিয়ে প্রিয়রঞ্জন প্রশ্ন করলেন, বঙ্কিমবাবু বিশুর কাছে গিয়েছিলেন?

—হ্যা, গিয়েছিল।

—কেন?

হাত দেখাতে, ইলেকশনের ভবিষ্যৎ জানতে।

— ড্রইংরুমে বসে তিনি লখনউর সেই ঘটনা নিয়ে চিন্তা করছিলেন?

করেছিল।

-বঙ্কিমবাবু কি সন্দেহ করেন, বিশু তাকে ব্ল্যাকমেল করছে?

—মোটেই না। বিশু সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উচু। বঙ্কিম ভাবছে, তার লখনউর পুরনো শত্রু কেউ পিছনে লেগেছে। কিন্তু আমার অনুমান, এ কাজ বিশুর।

হুম!—প্রিয়রঞ্জন চেয়ারে ঠেস দিয়ে নিথর হয়ে বসে রইলেন। —প্রিয়, শোন্ তোর এই বি ছোকরা মহা ধড়িবাজ। ওকে তাড়ানো উচিত।

—ঘাড় নাড়লেন প্রিয়রঞ্জন। সমর্থন, না, প্রতিবাদ, ঠিক বোঝা গেল না। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?—বললেন,শশাঙ্কনাথ, বিশু বাঙ্গলোর থেকে ফিরছে কবে?

-আজ-কালের মধ্যেই।

—তোর যন্ত্র দিয়ে বিশুর চিন্তা গোপনে জেনে নিলে কেমন হয়? তাহলে ও কী কী বদ মতলব অটিছে একটু হদিশ পাওয়া যায়। আমিও তাই ভাবছিলাম— বললেন প্রিয়রঞ্জন।

দুদিন পরের ঘটনা। সকাল প্রায় দশটা। প্রিয়রঞ্জন মিত্রভবনে ড্রইংরুমে বসে। সামনে টেবিলের ওপর বিছোনো একটা নকশা-আঁ কাগজ। দরজার বাইরে

পায়ের শব্দ হল। বিত উকি মারল দরজায়।

এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।ডাকলেন। প্রিয়রঞ্জন। বিশু ঢুকল ঘরে।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, এই ডিজাইনটা দেখ। কাল টমসন অ্যান্ড থমসন কোম্পানিকে এই ডিজাইন মিলিয়ে পার্টস তৈরির অর্ডার দিয়ে আসবে। আমি ওপরে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেক পরে 'আসব। কোথাও গোলমাল লাগলে তখন বুঝে নিও।

এই ঘরে বসেছেন যে? -বিশু একটু অবাক হল। রোদুরে বেশ পিঠ দিয়ে বসেছিলাম। মেশিনঘরটা যা চাপা! খেন আর কে আসবে এখানে? তুমি এখানেই বোসো। দরজাটা বরং বন্ধ করে দিও।—বিশুকে নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়লেন প্রিয়রঞ্জন।

যদি বিকেলে করি?—বিশু ইতস্তত করে। বোধহয়, এখন আটকে যাওয়ার ইচ্ছে ওর।

-না না, বিকেলে আমি থাকব না। সায়ন্স কলেজে লেঙ্কার শুনতে যাব। ফিরতে রাত হবে। এখনই বুঝে নাও।

বেজার মুখে বিশু প্রিয়রঞ্জনের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ল।

দরজার দিকে এগোতে এগোতে থমকে গিয়ে বললেন প্রিয়রঞ্জন, আজ বিকেলে আমাকে একজন টেলিফোন করতে পারে। প্রফেসর অমরেন্দ্র ঘোষ। বলেছিল, টেলিফোন করে 'আমি বাড়ি আছি কিনা জেনে নিয়ে আসবে। যদি ফোন করে, বলে দিও কাল আসতে। বংশীকেও বলে দিচ্ছি।

সমীরদা থাকবে না বিকেলে? জিজ্ঞেস করল বিশু। —না। সমীরও লেকচার শুনতে যাবে। প্রিয়রঞ্জন বেরিয়ে গেলেন। বিশু বু প্রিন্টটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ সে মুখ তুলে তাকাল অ্যাকোয়ারিয়ামটারদিকে। হালকা স্বচ্ছ জলপূর্ণ আধারে রকমারি আকৃতির নানারঙের পাথরের অসিল প্রবালের ফাকে ফাকে সাঁতরে বেড়াচ্ছে কত রকম মাছ। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। নাঃ, শুধু সৌন্দর্য উপভোগ উদ্দেশ্য নয়া বিশুর। সন্দিগ্ধ নয়নে সে খুটিয়ে দেখল মৎসাধার। আকোয়ারিয়ামের দ্বিতীয় আলোটা জ্বলছে না। নিশ্চিন্ত হল বিশু। মিনিট পাঁচেক নকশাটা লক্ষ করার পর চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সে। ঘন্টা দুই পর।

পার্ক স্ট্রিটের এক নামী রেস্তোরাঁয় নিভৃত কেবিনে মুখোমুখি বসেছেন প্রিয়রঞ্জন এবং শশাঙ্কনাথ। আধঘন্টা আগে প্রিয়রঞ্জনের জরুরি আহবানে অফিস থেকে সোজা এখানে এসেছেন শশাঙ্কনাথ, প্রিয়রঞ্জন অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই বোঝা গেল, গুরুতর কিছু ঘটেছে।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, আজ সকালে বিশু গট-ওয়েত রেকর্ড করেছি মিনিট দশেক। ও টের পায়নি? বললেন শশাঙ্কনাথ।

—না। অ্যাকোয়ারিয়ামের ইনডিকেটর বাঘটার কানেকশান অফ করে রেখেছিলুম। তাই ও বুঝতে পারেনি, মেশিন চালিয়েছি। অবশ্য বেশিক্ষণ রেকর্ড করতে ভরসা পাইনি, যদি সন্দেহ করে উঠে মেশিনঘরে গিয়ে দেখে!

—কী পেলি? অমরের প্রশ্ন ও-ই ফাস করেছে। আমি নামটুকু মাত্র ওর কাছে উল্লেখ করেছিলাম। বিশু তারপর অমরের হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন নিয়ে ভেবেছে। কিন্তু এতে আমি অবাক হইনি খুব একটা, এ আমি আশাই করেছিলাম। আমি আশ্চর্য হয়েছি, ও ডক্টর আয়ারের নাম জানল কী করে? আয়ারের সঙ্গে কি বিশুর যোগাযোগ হয়েছে?

—বিশু যে তোর চেনা আয়ারের কথা চিন্তা ছিল, তার প্রমাণ।

সঠিক প্রমাণ নেই, আমার বিশ্বাস। দুইয়ে দুইয়ে চার, এ-ই আর কী! অর্থাৎ গভীর ষড়যন্ত্র! শশাঙ্ক চিন্তিতভাবে মস্তক আন্দোলিত করলেন। প্রিয়রঞ্জন বললেন, বিশু একটা প্ল্যান করেছে আজ সন্ধ্যায়। টুকরো টুকরো এলোমেলোভাবে ভাবছিল। সেই প্রসঙ্গে আয়ারের নামও ভেবেছে।

—আজ বিকেলে কেন?

—ঠিক বুঝছি না। তবে আজ সন্ধ্যায় আমি বাড়ি থাম্ব না, ও জানে। কিন্তু ঠিক কী করতে চায় বুঝতে পারছি না।

বাড়িতে আর কে থাকবে? -শুধু বংশী। অম! এক হিসাবে এ ভালোই হল। -বললেন শশাঙ্কনাথ, বিশুর যদি কোনো বদ মতলব থাকে, আজই হাতে-নাতে ধরব। তুই লেকচার শোনা বাদ দে। আজ আমরা লুকিয়ে শ্রীশানের কার্যকলাপ ওয়াচ করব।

-কোথা থেকে?

-না না, ওয়াচ করার দায়িত্ব তোর নয়, সে ব্যবস্থা আমার। আমরা দুজন অপেক্ষা রব আমার ভগ্নীপতি বঙ্কিমের বাড়িতে। তারপর যথাসময়ে অকুস্থলে হাজির হব। নয়তো আমাদের কাউকে মিত্রভবনের কাছে ঘোরা-ফেরা করতে দেখলে বিশু সাবধান হয়ে যাবে।

—কে ওয়াচ করবে?

সে আমি ব্যবস্থা করব, তোকে ভাবতে হবে না। তুই বিকেলে বাড়ি ফিরেই লেকচার শোনার নাম করে বেরিয়ে পড়বি। শ্যামবাজার কফি হাউসের সামনে আমি অপেক্ষা করব। তারপর দুজনে চলে যাব বঙ্কিমের বাড়ি। দেখা যাক কী হয়। আমার কিন্তু দারুণ থ্রিল লাগছে রে!—উৎসাহিত শশাঙ্কনাথ প্রিয়রঞ্জনের পিঠ চাপড়ে দিলেন—হ্যা, একটা কথা, বংশীকে ছুটি দিয়ে দিস, ধরু, সিনেমা দেখার। বাড়ি যেন একদম ফাঁকা থাকে। মানে, শুধু বিশু থাকবে। তারপর জমবে নাটক।

নয়

ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

টেলিফোন আর্তনাদ করামাত্র শশাঙ্কনাথ লাফ দিয়ে উঠে রিসিভার কানে লাগালেন। একটুক্ষণ শুনলেন কারও কথা। চাপা স্বরে বললেন, বেশ যাচ্ছি আমরা। রিসিভার নানালেন তিনি।

বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে টেলিফোনের সামনে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন শশাঙ্কনাথ এবং প্রিয়রঞ্জন। প্রিয়রঞ্জনের উৎসুক চোখে প্রশ্ন ফুটে ওঠে। শশাঙ্কনাথ উত্তেজিত কন্ঠে বললেন, বংস, উত্তিষ্ঠিত! জাগ্রত ! ডাক এসেছে।

মিত্রভবনের কাছে প্রিয়রঞ্জনের গাড়ি এসে থামল। নামলেন দু'জনে। জানুয়ারির শেষ। শীতের সন্ধ্যায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে কুয়াশায়। কত গাঢ় হয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। পথচারীর সংখ্যা কম। তীব্র হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে ট্রাংক রোড ধরে। ছুটে যাচ্ছে প্রাইভেট মোটর, লরি, বাস।

একটি মানুষ কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে নিঃশব্দে গাড়ির গা ঘেষে দাড়াল। শশাঙ্কনাথ ডাকলেন—এই যে ডাম্বেল!

ডাম্বেল নামধারী যুবক দৃঢ়শরীর, দীর্ঘকায়। পরনে কালো রঙের ফুল প্যান্ট ও ছাইরঙা গরম সোয়েটার।

ইনি হচ্ছেন ডাম্বেল, মানে ডাক-নাম আর কী! -পরিচয় করিয়ে দিলেন শশাঙ্কআমার বোনপো এবং এখানকার থানার সাব ইন্সপেক্টর। ভালো নাম সুব্রত না। আজকের 'অপারেশনের জন্যে এর সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছি। এতক্ষণ ও-ই তোমার বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল। প্রিয়রঞ্জন ও সুব্রত নাগ ওরফে ডাম্বেল পরস্পরকে নমস্কার জানালেন। শশাঙ্কনাথ বললেন, ডাম্বেল, তুমি বলহ, বিশ মিনিট চল্লিশ হল মিত্রভবনে ঢুকেছে?

—সঙ্গে আর একটা লোক ছিল?

—হু।

—আর বেরোয়নি?

এবার কী কর্তব্য?

—আমাদের বাড়িটায় ঢোকা উচিত। ওরা কী করছে দেখা যাক।

—উত্তম। জোরে জোরে বারকয়েক নিঃশ্বাস টেনে, হাতের মুঠো বারকয়েক খোলা-বন্ধ করে, বুক চিতিয়ে এগোলেন শশাঙ্কনাথ। পিছনে চললেন সুৱত এবং প্রিয়রঞ্জন। তিনঙ্গনে এসে থামালেন মিত্রভবনের গেটের পাশে পাঁচিলের আড়ালে।

অন্ধকার মিত্রভবন। গেটের সামনের আলোটা জ্বলছে না। বাড়ির মেনো জানলায় আলোর চিহ্ন নেই। বেশির ভাগ জানালার বাট বন্ধ।

ওই ঘরে আলো জ্বলছে। -আঙুল তুলে দেখালেন প্রিয়রঞ্জন—এটা আমার শোওয়ার ঘর, তালা দেওয়া থাকে। আশ্চর্য!

অন্যরা দেখলেন, দোতলার একটা ঘরে ঘুলঘুলি-পথে ক্ষীণ আলোর রেখা চুইয়ে আসছে।

সুব্রত তৎপর হলেন—চলুন ভিতরে। আমায় পথ দেখান। একদম শব্দ করবেন না। সদর দরজা ঠেলতে বোঝা গেল, ভিতর থেকে তা বন্ধ। আর কোনো পথ আছে ভিতরে ঢোকার? – জিজ্ঞেস করলেন সুব্রত। আছে, খিড়কি-দরজা। জানালেন প্রিয়রঞ্জন। খিড়কি-দরজায় মস্ত তালা ঝুলছে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, বংশী তালা দিয়ে বেরিয়েছে। সিনেমা দেখে এই পথে ঢুকবে।

সুব্রত পকেট থেকে কয়েকটা সরু লোহার কাটা বের করলেন। তালার গর্তে ঢুকিয়ে বারকয়েক এপাশ-ওপাশ চাপ দিতেই হঠাৎ খট করে তালাটা খুলে গেল।

শশাঙ্কনাথের চক্ষু ছানাবড়া। ফিসফিসিয়ে বললেন, হ্যাহে ডাম্বেল, তুমি পুলিশ, না, চোর?

চোর ধরতে গেলে চোরের ট্রেনিংও কিছু কিছু জানা দরকার। মুচকি হেসে চাপা স্বরে বললেন ডাম্বেল।

দরজা কিন্তু খুলল না। ভিতর থেকে খিল বন্ধ।

এ নিশ্চয়ই বিশুর কীর্তি।—প্রিয়রঞ্জন বললেন, বংশী যাতে না তার অজান্তে বাড়ি ঢুকে পড়ে, তার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সুব্রত ওরফে ডাম্বেল এবারও দমলেন না। সরু একটা লোহার পাত বের করে দুই কৰাটের কে দিয়ে গলিয়ে খিলটা তুলে এমন কায়দায় নামলেন যে, কোনো শব্দ হল না।

ভিতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকার উঠোন। রান্নাঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলতে খুলে গেল। ঘুটঘুট করছে ভিতরে।

সুব্রত টর্চ বের করলেন। তিনজনে নিঃশব্দে চললেন রান্নাঘর পেরিয়ে ভিতরের প্যাসেজে। তারপর সিঁড়ি ধরে দোতলায়।

প্রিয়রঞ্জনের শয়নকক্ষের দরজা ভেজানো। সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে কপাটের হ্যাক পয়ে। সুব্রত আঙুলের ঠেলায় কপাট আর এক ফাঁক করে ইশারায়

ডাকলেন প্রিয়রঞ্জনকে।

প্রিয়রঞ্জন দেখলেন, ঘরের মধ্যে দু'টি লোক। একজন বিশু, দ্বিতীয় জন অচেনা। অচেনা লোকটি গাঁট্টাগোট্টা, ফুলপ্যান্ট ও হাতকাটা স্পোর্টস গেঞ্জি-পরা। দেওয়ালের ধারে রাখা একটা স্টিল ক্যাবিনেটের সামনে দাড়িয়ে ল জানি যেন করছে সে। পাশে লোহার আলমারিটা হাট করে খোলা। পড়ার টেবিলের ওপর একরাশ কাগজপত্র। বিশু একখানা বড় নকশা-আঁকা কাগজ উজ্বল বৈদ্যুতিক বাতির তলায় মেলে একমনে পরীক্ষা রছে। প্রিয়রঞ্জনের মুখ লাল হয়ে উঠল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। সুত্রত আস্তে তার হাতে চাপড় দিয়ে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন।

সহসা চাপা হর্ষধ্বনি শোনা গেল ঘরে। অচেনা লোকটি একটানে ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ার খুলে ফেলেছে।

বাঃ!-বলে বিশু হাতের কাগজখানা টেবিলে রেখে তার কাছে এগিয়ে এল। বলল, এর মধ্যেই বাকি র-প্রিন্ট আর ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলো আছে। এই ঘরেই সৰ রাখেন ডক্টর রায়, আমি জানি। বাহাদুর বটে তুমি, এত চটপট খুলে ফেললে!

বিশুর প্রশংসা-বাক্যে দ্বিতীয় লোকটির বুলডগের মতো মুখে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। ফুটল।

ইন্সপেক্টর সুব্রত নাগ চকিতে কপাট খুলে দরজা আগলে দাঁড়ালেন। কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, ব্যাপার কী? ছছানেলাল, তোমার সাহস তো কম নয়! ফের অমির এলাকায় বিশু ও তার সঙ্গী যেন ভূত দেখল। কয়েক মুহূর্ত তারা থ হয়ে রইল। কিন্তু ছছানেলাল অতি তৎপর। ত্বরিত গতিতে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোর সুইচটা অফ করে দিল সে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজার গোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন সুব্রত। তারপরই প্যাসেজের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ফের জ্বলে উঠল বান্ধ। ঘরের নয়, প্যাসেজটার। জ্বেলে দিয়েছেন প্রিয়রঞ্জন।

মেঝের ওপর দেখা গেল দুই যুযুধান মূর্তিছোনেলাল এবং সুব্রত। ছোনেলালকে বজ্র-আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরেছেন সুব্রত, হোনেলাল প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। বিশুর দেখা নেই। সে কি পালিয়েছে?

সহসা ছোনেলালের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুসি কাল সুব্রত, হোনেলালের চিবুক কেটে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। এলিয়ে পড়ল সে। সুব্রত কঠিন গলায় বললেন, বাড়াবাড়ি কোরো না ছেনে, পালাতে গেলে গুলি করব। আমার কাছে রিভলবার আছে।

ছোনেলাল নিথর হয়ে গেল। আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না সে।

সহসা ঘরের মধ্য থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এল একজন বিশু। এতক্ষণ ঘরেই ছিল সে। দুদ্দাড় করে সে ছুটল প্যাসেজ দিয়ে সিড়িতে নামার দরজা লক্ষ্য করে।| শশাঙ্কনাথ প্যাসেজের কোণে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে কঁাধ ম্যাসাজ করছিলেন। পলায়মান ছোনেলালের সঙ্গে অন্ধকারে তার দেহের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ছোনেলাল পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। ইত্যবসরে সুব্রত ঝাপিয়ে পড়েছিল ছোনের ঘাড়ে। কিন্তু সংঘর্ষে বেচারা শশাঙ্কনাথের অবস্থা কাহিল। বিশু একলাফে সুব্রত ও ছছানেলালকে টপকে পেরিয়ে শশাঙ্কনাথের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, নিজের ব্যথা ভুলে তক্ষুণি পা চালালেন শশাঙ্কনাথ। সেই দশ পদাঘাতে দেওয়ালে যা খেয়ে ছিটকে গড়িয়ে পড়ল বিশু। যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। মনে হল, কোমরে আঘাত পেয়েছে। শশাঙ্কনাথও ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গিয়েও ফের চট করে উঠে ভূলুণ্ঠিত বিশুর বুকের ওপর চেপে বসলেন। ওই বিপুল দেহভারে চাপা পড়ে আর নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না বিশুর।

কাধের বেদনা ভুলে শশাঙ্কনাথ একগাল হেসে বললেন, দেখলি ডাম্বেল, এখনও কী বডি ফিট। বাবা, স্কুল-কলেজের টিমে স্টপার খেলতাম যে!

পকেট থেকে সরু শক্ত দড়ি বের করে ছেনেলাগের হাত পিছমোড়া করে বাঁধলেন সুব্রত, তার পাও বাঁধলেন। দেখাদেখি শশাঙ্কনাথ তার রুমাল বের করে বিশুর দুপায়ে পেচিয়ে গিট লাগালেন।

আপনারা দাঁড়ান, আমি আসছি।-বলে সুব্রত গটগট করে একতলায় নেমে গেলেন। একটু বাদেই হুইসলের তীক্ষ্ণ ধ্বনি শোনা গেল। পরক্ষণেই দু'জোড়া বুটের আওয়াজ উঠে এল ওপরে। সুব্রতর সঙ্গে এসেছে এক পুলিশ কনস্টেবল।

এবার এদের থানায় নিয়ে যাই? —সুব্রত জিজ্ঞেস করেন। সুব্রতবাবু।

ইঙ্গিতে ডাকলেন তিনি সুব্রতকে। তিনজনে প্রিয়রঞ্জনের ঘরে প্রবেশ করে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। বন্দিদের পাহারায় রইল সেপাই।

টেবিলের ওপর জড়ো করা মেশিনের ডিজাইন আঁকা কাগজ এবং কিছু টাইপ কাগজের তাড়া দ্রুত পরীক্ষা করলেন প্রিয়রঞ্জন। আলমারির ভিতরে এবং ক্যাবিনেটের ড্রয়ারগুলোর ভিতরটা দেখলেন উলটে-পালটে। তারপর নিশ্চিতভাবে বললেন, যাক, সব ঠিক আছে। এদের নিয়ে এখন কী করতে চান সুব্রতবাবু?

—হাজতে পুরব। তারপর কেস হবে। আপনার বাড়িতে চুরির চার্জ। আমি কেস করতে চাই না।—বললেন প্রিয়রঞ্জন।

কেন? – মামা-ভাগ্নে দুজনেই অবাক।

কারণ, বিশু কাঠগড়ায় দাঁড়ালে উকিলের জেরায় আমার রিসার্চ সম্বন্ধে অনেক কথা জানাজানি হয়ে যাবে। তাতে আমার ক্ষতি হবে।

ইন্সপেক্টর সুব্রত বুদ্ধিমান লোক। প্রিয়রঞ্জনের রিসার্চ কী নিয়ে, কী তার গুঢ় রহস্য, এসব না জেনেও ব্যাপারটা আঁচ করে ফেললেন তিনি। বললেন, বেশ, আপনার যা মর্জি। ওদের বিরুদ্ধে আপনার বাড়িতে চুরির সে আনৰ না। তবে ছোনেলালকে ছাড়ছি না। দু-দুটো সিন্দুক ভাঙার কেসে পুলিশ ওকে অনেক দিন ধরে খুঁজছে।

বিশুটা শয়তান, ওর শাস্তি হওয়া উচিত। কিঞ্চিৎ উমাসহ জানালেন শশাঙ্কনাথ।

বলেন তো ওকে অন্য কেসে জড়িয়ে দিই। থানায় নিয়ে দু'চার ঘণ্টা উত্তম-মধ্যম দিই। কিছুটা শাস্তি হোক!

—মামার সমর্থনে যোগ দিলেন সুব্রত নাগ ওরফে ডাম্বেল। থাক্। কিছু শাস্তি ও পাবে। তাছাড়া একটা চান্স দিই ওকে। জেলে গেলে ও পাশ। ক্রিমিনাল বনে যাবে। আর ভদ্রভাবে বাঁচার উপায় থাকবে না ওর।

—বললেন প্রিয়রঞ্জন।

তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পাড়ে, ইসঙ্গে থানামে লে যাও। ছোনেলালকে দেখিয়ে হুকুম দিলেন সুব্রত। সিপাহিজি হোনের পায়ের বাধন খুলে জামা ধরে হ্যাচকা টানে তুলল তাকে। অতঃপর তার ঘাড়ে এক রক্ষা কষিয়ে ঠেলা মেরে বলল, চল বুবাক!

ছোনে মহাধূর্ত। সে আন্দাজ করে নিল, তার ভাগ্যেই থানা-পুলিশ ঝুলছে, বিশু বোধহয় বেকসুর খালাস পাবে। কয়েক পা গিয়ে থমকে ফিরে কর্কশ গলায় সে বলল, এ বিশুবাবু, হামার পাওনা হাজার রুপেয় হামার শারেদের হাতে ঠিক জমা করে দিবেন।

আঁ!—বিশুর গলা দিয়ে অর্ধস্ফুট আর্তনাদ বেরোল। হামার ডিউটি হামি করেসি, লেকিন টাকা না দিলে বহুৎ মুশকিল হোবে, হাঁ।ছোনে। চোখ পাকাল।

চল চল বেল্লিক কাহাকী! সেপাইয়ের সম্ভাষণ মধুর ধাক্কা খেতে খেতে ছোনে সিড়ির পথে অদৃশ্য হল। ফ্যাকাসে মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে রইল বিশু।

সুব্রত বিশুর পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে আদেশ করলেন,—উঠে দাঁড়াও! বিশু কাঁপতে কাঁপতে উঠল। এ কাজ কেন করলে?—কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন প্রিয়রঞ্জন। বিশু চুপ। –কে তোমায় পাঠিয়েছে? কে চুরি করতে বলেছে? সত্যি করে বলো? বিশু নীরব। তার মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। —ডক্টর আয়ার, তাই না? ভীত চোখে একবার চকিতে মুখ তুলে তাকিয়ে বিশু আবার মাথা নামাল।

বুঝেছি, বললেন প্রিয়রঞ্জন, শোন বিশু, এবার তোমায় মাপ করছি, পুলিশে দেব। কিন্তু ভবিষ্যতে এ বাড়িতে তুমি আর কখনও পা দেবে না। যাও, বেরিয়ে যাও!

ভয়ে, লজ্জায়, যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ বিশু একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না, কারও দিকে তাকাতে পারল না, ধীরে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল।

শোনো, ডাকলেন প্রিয়রঞ্জন—এখন তোমার ঘরে ঢুকবে না। সোজা চলে যাও। আমি তোমার ঘর সার্চ করব। দেখব কী শ জিনিস তুমি চুরি করে রেখেছ। হ্যা, মনে রেখো, আমার যন্ত্রের সাহায্যে অনেকের গোপন কথা জেনে নিয়ে তুমি

তাদের ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছ, এ খবর আমি জানি তাদের নাম-ঠিকানাও আমি জানি। ভবিষ্যতে এ চেষ্টা ফের করেছ কি তোমায় ঠিক পুলিশে দেব।

বিশু ক্ষণকাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বেরিয়ে গেল।

আমি ওকে বিদায় করে আসছি।-বলে সুব্রত বিশুকে অনুসরণ করলেন। কিছু পরে সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল। সুব্রত ফিরে এলেন।

যাক, ঝঞ্ঝাট মিটল! প্রিয়, এবার কিন্তু সাবধানে থাকিস। আয়ার অতি ঘুঘু লোক। —বললেন শশাঙ্কনাথ।

প্রিয়রঞ্জন চেয়ারে বসে পড়েছেন। উত্তেজনার শ্রান্তিতে হয়তো অবসন্ন বোধ করছেন তিনি। শশাঙ্কের কথায় মৃদুস্বরে বললেন, ই, ঠিক আমার আগেই সাবধান হওয়া উচিত বলে তিনি উঠে পড়ে ডাকলেন—ঘরে আয় শশাঙ্ক। সুব্রতবাবু, আপনিও আসুন। আপনাদের সাক্ষী রেখে আমি একটা কাজ করতে চাই।

ক্যাবিনেট ও আলমারি থেকে বেছে বেছে এক টেবিলে রাখলেন প্রিয়রঞ্জন। কাগজগুলো দেখিয়ে বললেন, এর মধ্যে আছে আমার নকশা ও টাইপ করা কাগজ আবিষ্কারের চাবিকাঠি, আমার চিন্তা-গ্রাহক যন্ত্রের প্রিন্ট আর কনি।

প্রিয়রঞ্জনের চোখ-মুখ কী এক চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে, লাল হয়ে উঠেছে। একটা মোমবাতি জ্বালালেন তিনি। তারপর যা করলেন, দেখে শশাঙ্কনাথ ও সুব্রত থ হয়ে গেল।

কাগজের মোটা এক বান্ডিল পাকিয়ে প্রিয়রঞ্জন মোমবাতির শিখায় ধরলেন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কাগজগুলো।

এ কী! প্রিয়, তুই কি পাগল হলি? শশাঙ্কনাথ প্রিয়রঞ্জনের হাত চেপে ধরলেন।

পাগল হইনি। মৃদুটানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন প্রিয়রঞ্জন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, খুব ভেবেচিন্তেই আমি এ কাজ করছি। আমার আবিষ্কার আমি নিজের হাতেই ধ্বংস করে ফেলব। কিন্তু কেন? তোর এতদিনের সাধনা, পরিশ্রম! – শশাঙ্কনাথ থই পান না।

—ঠিক, আমার বহুদিনের সাধনা এসব। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ আবিষ্কার মানব-সমাজে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করবে। মানুষের সৎ প্রবৃত্তির চেয়ে তার অসৎ প্রবৃত্তিই বেশি প্রবল। মানুষের লোভের সীমা নেই। মানুষের সব গোপন চিন্তাকে চুরি করে জানলে আমাদের সমাজ-সংসার হয়তো তছনছ হয়ে যাবে। আমার গুরু ডক্টর রজার্স আমায় এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তখন আমি শুনিনি, বিশ্বাস করিনি, এতটা ভেবে দেখিনি। আমার মত পালটে গিয়েছে। রজার্স ঠিকই বলেছিলেন।

হঠাৎ তোর মত পালটাল কেন? —শশাঙ্কনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

—হঠাৎ নয়, একটু একটু করে পালটেছে। অমরেন্দ্র, সমীর, বিশু, এদের কেসগুলো ভেবে দেখ। আমার মেশিন তাদের উপকার করেছে, না, সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে? ঠিকমতো মানুষের কল্যাণে এ মেশিন ব্যবহার করা বোধ হয় সম্ভব হবে না। কিছুদিন ধরেই আমার মনে এই সন্দেহ জাগছিল, থাক, আপাতত সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলি, রাতে মেশিনের পার্টসগুলো আলাদা করে ফেলব। ব্যস, ইতি। সুব্রতবাবু, অনেক ধন্যবাদ। এই চুরি ঠেকিয়ে মানুষের মত উপকার করলেন। আমার পেপারস আয়ারের হাতে পড়লে সর্বনাশ হত।

সেই অমূল্য গবেষণাপত্রগুলির ধুমায়মান বহ্নি-উৎসব দেখতে দেখতে শশাঙ্কনাথ বিড়বিড় করেন, কী আশ্চর্য আবিষ্কার! ইস্।

প্রিয়রঞ্জন, যেন নিজের হাতে নিজের চিতায় অগ্নিসংযোগ করে চলেছেন। বিষয় দৃষ্টি তার লেলিহান শিখার প্রতি নিবদ্ধ। অন্তরের অন্তঃস্থলে তীব্র ব্যথার আলোড়ন, কিন্তু বাইরে ধীর, সংযত।

ইন্সপেক্টর সুব্রত নাগ নীরব দর্শক। এক বিচিত্র নাটকের অভিনয় দেখছেন তিনি। তার

স্মৃতির মণিকোঠায় এই ঘটনা, এই দৃশ্য অক্ষয় হয়ে থাকবে।

একটু হেসে বললেন প্রিয়রঞ্জন, শশাঙ্ক, দুঃখ করিস না। আমার এই রিসার্চের অভিজ্ঞতা নষ্ট হবে না। আমি আর এক নতুন লাইনে গবেষণা করব, ঠিক করেছি। তাতে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাব। অবশ্য আর ভুল করছি না। যদি নতুন আবিষ্কার সফল হয়, তাকে শুধু মানুষের ভালর জন্যেই ব্যবহার করা যাবে।

প্যাসেজে পায়ের শব্দ। দরজায় উকি দিল বংশী। সিনেমা দেখে ফিরেছে। ঘরে জ্বলন্ত কাগজের স্তূপ দেখে সে ‘ফ্রিজ’ হয়ে গেল।

বংশী, এই পোড়া কাগজগুলো সাফ করে ফেল। আর তিন কাপ কফি বানাও, —বললেন প্রিয়রঞ্জন। কফি কি এ ঘরে দেব?—বংশী জানতে চাইল।

নাঃ! ঘরটা বেজায় নোংরা হয়েছে। নিচে ড্রইংরুমে দাও। কী রে শশাঙ্ক, ড্রইংরুমে বসতে বোধকরি তোর আর আপত্তি নেই?

সমাপ্ত

জোনাকিদের বাড়ি এক পেখম স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আকাশের বন্ধু ইন্দ্রনীল সান্যাল

জোনাকিদের বাড়ি চব্বিশ পুশকিন স্মরণজিৎ চক্রবর্তী